মালদা

সিদ্ধার্থ গুহরায়

সুবর্ণরেখা
কলিকাতা

প্রথম মুদ্রণ : ১ বৈশাখ ১৩৯১
প্রচ্ছদপট : বিমল মজুমদার

প্রকাশক : ইন্দ্রনাথ মজুমদার সুবর্ণরেখা : ৭৩ মহাত্মা গান্ধি রোড,
কলকাতা ৭০০০০৯ মুদ্রাকর : ছবি বর্মণ রমা প্রিন্টিং ওয়ার্কস।
১ কালিদাস সিংহ লেন কলকাতা ৭০০০০৯

সূচীপত্র

১
সাধারণ পরিচিতি

মালদা জেলার নাম 'মালদা' হলো কেন তা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে বিতর্ক আছে। ধরা হয়, ফার্সী 'মাল' এবং বাংলা 'দহ' এই দুটি শব্দের মিলনেই মালদহ নামের উৎপত্তি। মালদহের চলতি রূপ মালদা, ফার্সী 'মাল' শব্দের অর্থ সম্পদ আর বাংলা 'দহ' শব্দের অর্থ সাগর। অর্থাৎ সম্পদের সাগর এরকম কিছু একটা বোঝাতে গিয়েই মালদহ নামটা এসেছে। মধ্যযুগে এই অঞ্চল গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক কেন্দ্র হিসাবে গড়ে উঠেছিল। তার থেকেই এরকম একটা নাম আসা খুবই স্বাভাবিক। মালদহ নামকরণ নিয়ে আর একটি মতবাদও প্রচলিত আছে। এই অঞ্চলে একসময় 'মলদ' নামে এক কৌমগোষ্ঠী (tribe) বসবাস করতো। এদের বর্তমান প্রজাতি বসবাস করে বিহারের রাজমহল পাহাড়ের কাছে। এদের বলা হয় মালপাহাড়ী। অনেকের মতে 'মলদ' শব্দ থেকেই মালদা, মালদহ – ইত্যাদি নামগুলো এসেছিল।

মালদা জেলা ২৪°৪১' থেকে ২৫°৩২'৩০" উত্তর অক্ষাংশে এবং ৮৭°৪৮' থেকে ৮৮°২৮' পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত। উত্তর দক্ষিণে প্রবাহিত মহানন্দা নদী মালদা জেলাকে দুটো সমান অংশে বিভক্ত করেছে। মহানন্দার পূর্ব তীরবর্তী অঞ্চলকে বরিন্দ বলা হয়। পশ্চিম তীরবর্তী অঞ্চলকে আবার বিভক্ত করেছে কালিন্দ্রী নদী। কালিন্দ্রীর উত্তর তীরস্থ এলাকা টাল এবং দক্ষিণ তীরবর্তী অঞ্চল দিয়ারা নামে পরিচিত।

মালদা জেলার উত্তরে পশ্চিম দিনাজপুর জেলা এবং দক্ষিণে মুর্শিদাবাদ জেলা, এর পূর্বদিকে বাংলাদেশের পূর্বদিনাজপুর জেলা ও পশ্চিমে রয়েছে বিহারের পূর্ণিয়া জেলা। মালদা জেলার বর্তমান আয়তন ১,৩৯২ বর্গমাইল।

মালদা জেলা গঠনের একটি সুদীর্ঘ প্রশাসনিক ইতিহাস আছে।

Buchanan Hamilton এর বিবরণ থেকে আমরা জানতে পারি যে ইংরেজ শাসনের গোড়ার দিকে মালদা কোন আলাদা জেলা ছিল না। বর্তমান মালদা জেলার কিছু অংশ ছিল পূর্ণিয়া জেলায়। বাকি অংশ ছিল দিনাজপুব জেলার অন্তর্ভূক্ত। ১৮১৩ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে তৎকালীন এক পুলিশ সুপার সরকারকে দিনাজপুর ও পূর্ণিয়ার কতগুলো জায়গার আইন শৃঙ্খলার অবনতির কথা জানান। তাঁর রিপোর্টে বলা হয় যে পূর্ণিয়া জেলার কালিয়াচক, শিবগঞ্জ, ভোলাহাট ও গর্গরিবা অঞ্চলে এবং দিনজাপুব জেলার মালদা ও কালিয়াচক থানায় চুরি, ছিনতাই, ডাকাতি ও অন্যান্য অপরাধ ক্রমেই বেড়ে চলেছে। এর কারণ দর্শাতে গিয়ে উক্ত পুলিশ সুপার বলেন যে জেলা সদর থেকে এই অঞ্চলগুলোর দূরত্ব এই ধরনের অপ্রীতিকব ঘটনার মূল কারণ। উদাহরণ হিসাবে তিনি বলেন যে কালিয়াচক পূর্ণিয়া থেকে ১০০ মাইলের বেশি দূরে অবস্থিত।

কিছু দিনের মধ্যেই ফল পাওয়া গেল। বর্তমান মালদা জেলার থানাগুলো এবং তাব সাথে শিবগঞ্জ, নবাবগঞ্জ, ভোলাহাট, নাচোল এবং গোমস্তাপুর থানাগুলোকে দেখাশোনা কবার জন্য একজন জয়েণ্ট ম্যাজিস্ট্রেট ও একজন ডেপুটি কালেক্টর নিযুক্ত হলেন। ১৮৩২ খ্রীস্টাব্দে মালদায় একটি ট্রেজারী স্থাপিত হলো। ধরা হয় যে এই সময় থেকে মালদা আলাদা একটি জেলা হিসাবে কাজ করতে থাকে। তবে ১৮৫৯ খ্রীস্টাব্দে জয়েণ্ট ম্যাজিস্ট্রেট পদটা উঠে যায় এবং একজন জেলাশাসক নিযুক্ত করা হয়। তখন মালদা স্বতন্ত্র একটি জেলার স্বীকৃতি লাভ করে।

১৮৫৯ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৮৭৬ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত মালদা জেলা রাজশাহী বিভাগের মধ্যে ছিল। তারপর যায় ভাগলপুর বিভাগে। ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দে মালদা আবার রাজশাহী বিভাগে চলে যায়।

১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দের ১২ই আগস্ট থেকে ১৫ই আগস্টের মধ্যে জানা যায় নি যে মালদা জেলা ভারতে থাকবে না পাকিস্তানে যাবে। ১৫ই এবং ১৬ই আগস্ট পূর্ব পাকিস্তানের এক জেলাশাসকের অধীনে মালদার শাসন কাজ চলে। কিন্তু রাডক্লিফ রোয়েদাদের রায় অনুযায়ী ১৭ই আগস্ট মালদার শাসনভার পশ্চিমবঙ্গের এক জেলাশাসকের হাতে

হস্তান্তরিত হয়। কিন্তু পূর্বতন মালদা জেলার শিবগঞ্জ, নবাবগঞ্জ, ভোলাহাট, নাচোল ও গোমস্তাপুর—এই থানাগুলো দেশভাগের সময় পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যে চলে যায়। এগুলো এখন বাংলাদেশের মধ্যে।

মালদার জেলা সদরের নাম ইংরেজবাজার। মালদা জেলায় অন্য কোন মহকুমা নেই। মালদা জেলা দশটি থানায় বিভক্ত (১) ইংরেজ-বাজার, (২) কালিয়াচক, (৩) পুরনো বা ওল্ড মালদা, (৪) গাজোল, (৫) হবিবপুর, (৬) বামুনগোলা, (৭) মানিকচক, (৮) রতুয়া, (৯) খরবা ও (১০) হরিশ্চন্দ্রপুর। জেলা সদরকে মালদা শহরও বলা হয়।

প্রাচীন যুগে বর্তমান ইংরেজবাজারের সামান্য দক্ষিণে অবস্থিত গৌড় অঞ্চলের খ্যাতি ছিল সুবিদিত। মধ্যযুগে গৌড়, পাণ্ডুয়া ও বর্তমান ওল্ড মালদার গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। আজকের মালদা শহর, যেটা ইংরেজ-বাজার নামে পরিচিত, গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে ইংরেজরা আসার পর। ইংরেজরা এই অঞ্চলকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যকেন্দ্রে পরিণত করেছিল। ইংরেজরা এখানে বসতি স্থাপন করার পরই ইংলিশবাজার বা ইংরেজবাজার নামগুলো এসেছিল। লোকমুখে শোনা যায় ইংরেজ-বাজারকে রংরেজবাজার নামেও ডাকা হতো। নীলকুঠির সাহেবরা এই শহরে রং তৈরি করতো। তাছাড়া এই শহর ছিল রং—এর এক গুরুত্বপূর্ণ বাজার। সেই থেকে হয়তো রংরেজবাজার নামটা এসেছিল রং+ ইংরেজ+বাজার—এইভাবে। রংরেজবাজার নাম এখন আর কারুর মুখেই শোনা যায় না।

২

প্রাকৃতিক পরিপার্শ্ব

ভূপ্রকৃতি

মালদা জেলার ভূপ্রকৃতি আলোচনা করতে গিয়ে প্রথমেই মালদার ভূমিরূপ নিয়ে কিছু কথা বলা দরকার। আগেই বলা হয়েছে যে মালদা জেলায় তিন ধরণের ভূমি দেখতে পাওয়া যায়—বরিন্দ, টাল এবং দিয়ারা। বরিন্দ অঞ্চল লালমাটি দিয়ে তৈরি। এখানকার মাটি উঁচুনীচু। এই মাটির তলা দিয়ে একটা ঢেউ খেলানো গ্রানাইট পাথরের স্তর চলে গেছে। নানা ধরনের আধুনিক যন্ত্র প্রয়োগ করেও ঐ স্তরকে বিদ্ধ করা সম্ভব হয় নি। ফলে এই অঞ্চলে গভীর অগভীর কোনো নলকূপই বসানো যায় না। বরিন্দ কথাটা এসেছে 'বরেন্দ্রী' শব্দ থেকে। খুব সম্ভবতঃ এই অঞ্চল প্রাচীন বাংলার 'বরেন্দ্রী' বা 'বরেন্দ্রভূমির' অন্তর্গত ছিল। গাজোল, হবিবপুর, বামুনগোলা—এই জায়গাগুলো বরিন্দ এলাকার মধ্যে রয়েছে।

কালো রং এবং নীল রং এর মাটি দেখা যায় টাল অঞ্চলে। এক সময় কুশী নদী যেখান দিয়ে বয়ে যেত, সেখানকার রং কালো। ফুলহরা এবং গঙ্গা বিধৌত অঞ্চলের রং নীলচে। খরবা, হরিশ্চন্দ্রপুর প্রভৃতি অঞ্চল টাল এলাকার মধ্যে পড়ে।

দিয়ারা গঙ্গার চর। এই মাটির রং নীলাভ। ইংরেজবাজার, কালিয়াচক, রতুয়া থানার কিয়দংশ দিয়ারার মধ্যে রয়েছে।

নদনদী

মালদা জেলার ভূমিরূপ নিয়ে আলোচনা করার পরই আসে জেলার নদনদীর কথা। মালদা জেলার মধ্য দিয়ে গঙ্গা, মহানন্দা, কালিন্দ্রী, টাঙ্গন, পূর্ণর্ভবা, বেহুলা, পাগলা, ফুলহরা, ভাগীরথী প্রভৃতি নদী উপনদী

ও শাখানদী বয়ে গেছে। একসময় কুশী নদীও মালদার ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হতো। এখন এই নদী বিহারে সরে গেছে।

গঙ্গা : গঙ্গার শুরু হিমালয় পাহাড়ে গোমুখ থেকে। তারপর দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে, বিহার পার হয়ে এসে রাজমহল পাহাড় ভেদ করে গঙ্গা নদী মালদা জেলায় প্রবেশ করেছে। পশ্চিমবাংলায় গঙ্গার এই প্রথম প্রবেশ। মালদা জেলায় প্রবেশ করে গঙ্গা দুভাগে বিভক্ত হয়েছে। একটি ধারা বাংলাদেশের রাজশাহী জেলায় প্রবেশ করে পদ্মা নাম ধারণ করেছে। আরেকটি ধারা মুর্শিদাবাদ জেলার মধ্য দিয়ে, ভাগীরথী নাম নিয়ে, কোলকাতা হয়ে বঙ্গোপসাগরে গিয়ে মিশেছে।

মহানন্দা : হিমালয়ের পাদদেশে পাগলাঝোড়া জলপ্রপাত মহানন্দার উৎসস্থল। এই নদী দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলা হয়ে, বিহারের অনেকটা অংশ অতিক্রম করে মালদায় প্রবেশ করেছে। মালদায় প্রবেশ করার আগে এই নদী বিহারের বাগজোবের কাছে দুভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। এই দুটি ধারা মহানন্দা ও ফুলহরা এই দুই নাম নিয়ে মালদায় প্রবেশ করেছে। মহানন্দা ধারার বাগজোবের পরের নাম বারসই শাখা। আগেই বলা হয়েছে যে মহানন্দা নদী মালদা জেলাকে সমদ্বিখণ্ডিত করেছে। মালদা জেলা অতিক্রম করে মহানন্দা রাজশাহীর গোদাগাড়ীর কাছে পদ্মায় এসে মিশেছে। তাই মহানন্দা পদ্মার উপনদী।

কালিন্দ্রী : মহানন্দার পশ্চিম তীরবর্তী অঞ্চলকে দুই ভাগে ভাগ করেছে কালিন্দ্রী নদী। এই নদী গঙ্গার একটি শাখা। এর গতি পূর্ব-মুখী। নিমাসরাইয়ের কাছে এই নদী মহানন্দার সাথে মিশেছে।

পুণর্ভবা : তিস্তার একটি স্রোতধারা এই পুণর্ভবা। রাজশাহীর রুকনপুর ঘাটের কাছে এই নদী মহানন্দায় মিশেছে।

টাঙ্গন : হিমালয় থেকে উৎপন্ন হয়ে বরিন্দ এলাকার ওপর প্রবাহিত হয়ে টাঙ্গন নদী মুচিয়ার কাছে মহানন্দায় এসে পড়েছে।

ভাগীরথী : গঙ্গা নদী মালদা জেলায় প্রবেশ করে 'ভূতনী দিয়ারা' নামে একটি ব-দ্বীপ সৃষ্টি করেছিল। সেখান থেকে একটি ধারা পঞ্চানন্দ

পুর, শাহুল্লাপুর ও গৌড় হয়ে মহদিপুরের পাশ দিয়ে চলে গেছে বাংলা-দেশে। এই ধারাটিই ভাগীরথী নামে প্রসিদ্ধ। এই ভাগীরথী ও দক্ষিণ-বঙ্গের ভাগীরথী কিন্তু এক নদী নয়। অনেকে বলেন যে, একাদশ-দ্বাদশ শতকে এই জলস্রোতকে গঙ্গার মূল ধারার থেকে খনন করে আনা হয়েছিল। গৌড় নগরীতে জলসরবরাহের প্রয়োজনেই না কি এই ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এই নদীর তটেই মালদা জেলার প্রধান শ্মশান ঘাট শাহুল্লাপুর অবস্থিত।

ফুলহরা : এই নদীটি মালদা জেলার পশ্চিম দক্ষিণে বয়ে গিয়ে ভূতনী দিয়ারার কাছে গঙ্গায় মিশেছে।

বেহুলা : সাহাপুর অঞ্চলের নিম্ন জলাভূমি থেকে উৎসারিত হয়ে বাংলা-দেশের নবাবগঞ্জের কাছে মহানন্দায় মিশেছে বেহুলা নদী। জনশ্রুতি আছে, বেহুলা লক্ষিন্দরের মৃতদেহ নিয়ে ভাসতে ভাসতে কালিন্দ্রী নদী হয়ে এই নদীতে এসেছিলেন। তাই এই নদীর নাম বেহুলা।

পাগলা : পঞ্চানন্দপুরের কাছে ভাগীরথীব মূলধারা থেকে বেরিয়ে এসে মালদা জেলার বাভীটোলা ও মোথাবাড়ির পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে পাগলা নদী কালিয়াচকে এসেছে। এখানে গঙ্গার আর একটি শাখাধারার সাথে পাগলা নদী মিলিত হয়েছে। গঙ্গার এই দ্বিতীয় ধারাটিও পাগলা নামে পরিচিত। এই ধারাটি গঙ্গার মূলধারা থেকে বেরিয়েছে ফরাক্কার কাছে চরবাবপুর এলাকায়। দুই পাগলা কালিয়াচকে মিলিত হয়ে মহদী-পুরের কাছে ভাগীরথীতে মিশেছে।

জলবায়ু

গ্রীষ্মকালে প্রচণ্ড উত্তাপ এবং শীতকালে তীব্র ঠাণ্ডা, মালদার জল-বায়ুর প্রধান বৈশিষ্ট্য। মালদা জেলার গোটা বছরকে মোটামুটি চার ভাগে ভাগ করা চলে। ইংরাজী মার্চ মাস থেকে মে মাস পর্যন্ত গ্রীষ্ম কাল। জুন মাস থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত চলে বর্ষাকাল। অক্টোবর মাস থেকে নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময়টাকে হেমন্তকাল বলা চলে।

এই সময় উত্তাপের তীব্রতা কমে আসে। মাঝে মাঝে বৃষ্টি হয়। এই সময় সন্ধের পরই বেশ ঠাণ্ডা বাতাস বইতে থাকে। নভেম্বর মাসের বাকি সময় থেকে ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ পর্যন্ত চলে শীতকাল।

গ্রীষ্মকালে দিনের বেলায় প্রচণ্ড গরম হাওয়া বইতে থাকে, সূর্যের প্রখর তাপ গরমকে আরও বাড়িয়ে দেয়। মালদা জেলার জলবায়ুর অন্যতম বিশেষত্ব এইযে, গ্রীষ্মকালে দিনের বেলায় প্রচণ্ড গতিতে পশ্চিমা বাতাস বইতে থাকে। গ্রীষ্মকালীন এই বাতাসকে 'পছিয়া' বাতাস বলা হয়। 'পছিয়া' কথাটা এখন লোকমুখে 'পইচ্ছা' রূপ ধারণ করেছে, 'পছিয়া' বা 'পইচ্ছা' এই কথাগুলো এসেছে পশ্চিমা কথা থেকে। এই 'পছিয়া' বাতাস এক এক সময় এমন তীব্র গতিতে বইতে থাকে যে, গ্রামের লোকেরা দিনের বেলায় তাদের উনুন ধরাতে পারেনা। আগের দিন রাত্তিরেই তাদের পরের দিনের রান্না করে রাখতে হয়। গ্রীষ্মকালে বিকেলের দিকে মাঝে মাঝে কালবৈশাখী ঝড়ও মালদা জেলাকে আঘাত করে। ঝড় হয়ে যাওয়ার পরই আবহাওয়া অনেকটা শীতল হয়ে যায়।

বর্ষাকালে বৃষ্টিও কম হয় না, মালদা জেলায় বার্ষিক বৃষ্টিপাতের গড় ৬০ ইঞ্চি থেকে ৬৫ ইঞ্চি। একসময় বরিন্দ এলাকায় প্রচুর শালবন ছিল। এখন অনেক বন কেটে ফেলায় বৃষ্টিপাতের পবিমাণ ঐ অঞ্চলে কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। তবুও ইংরাজী জুলাই-আগস্ট মাসে প্রায়ই বজ্র বিদ্যুৎ সহযোগে প্রবল বর্ষা নামে। সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত মৌসুমী বায়ু মালদা জেলায় বইতে থাকে।

উত্তুরে বাতাস আর শুক্‌নো আবহাওয়া, মালদা জেলার শীতকালীন বৈশিষ্ট্য। এই সময় খুব ঠাণ্ডা পড়ে। গ্রামগঞ্জের মানুষেরা আগুন জ্বেলে, তার চারপাশে বসে শীত তাড়াবার চেষ্টা করে। ফেব্রুয়ারির শেষ পর্যন্ত শৈত্য প্রবাহ মালদা জেলাকে আচ্ছন্ন করে রাখে। শীতকালে প্রায়ই কুয়াশা পড়ে। এক এক দিন শীতকালে, কুয়াশার জন্য বেলা ১১টা বা ১২টার আগে সূর্যের মুখ দেখা যায় না।

গ্রীষ্মকালে মালদা জেলাব তাপমাত্রা ৩৮° সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত ওঠে। আর শীতকালে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১১° সেন্টিগ্রেড।

বনজঙ্গল

বনজঙ্গল মালদা জেলার অর্থনীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। মালদা জেলার হালুয়া অঞ্চলে একটি সংরক্ষিত বনাঞ্চল আছে। প্রায় ৩৫০.০১ একর ধরে এই অরণ্যভূমি বিস্তৃত। এইটি ছাড়াও ছড়িয়ে ছিটিয়ে এই জেলায় অনেক বনভূমি আছে। সেগুলোর মধ্যে কালনা জঙ্গল, মহাদেব বটি জঙ্গল, জামালপুর জঙ্গল, পথেরবাণপুর জঙ্গল বিখ্যাত। পথেরবাণপুর জঙ্গলটিই সব থেকে বড়—১৫৭.৯১ একর। ভাসা জমিতে নলখাগড়া এবং কম জলা জায়গায় হিজল গাছ জন্মায়। বরিন্দের জমি কটাল নামে একটি কাঁটা গাছে পূর্ণ। পাকুয়া হাটের কাছে, শাল, তাল, শিমুল, বাবুল ইত্যাদি গাছ দেখতে পাওয়া যায়। জেলার বিভিন্ন স্থানে পিপুল, পাকুড়, বাঁশ প্রভৃতি গাছও রয়েছে। ষাটের দশকে বনজঙ্গল থেকে জেলার বার্ষিক আয় ছিল বছরে চল্লিশ হাজার টাকার মত। এখন তা আরও বেড়ে গেছে। ষাটের দশকের শেষাশেষি সময় থেকে পতিত জমিগুলোতে শিশু, কদম, ইউক্যালিপটাস ইত্যাদি গাছ বসানো শুরু হয়েছিল।

মালদা জেলার প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যে তুঁত আর আম বিখ্যাত। যেখানে তুঁতের চাষ হয়, সে জায়গাকে জুয়ার বলা হয়। রবিশস্যের মধ্যে কলাই, খেঁসারী, যব, তিসি, সরষে, ছোলা বিখ্যাত। আম কাঠ দিয়ে আসবাবপত্র আর বাবুল কাঠ দিয়ে গাড়ির চাকা তৈরি হয়।

৩

মালদার মানুষ

লোকসংখ্যা : ১৯৮১ খ্রীস্টাব্দের আদমসুমারী অনুযায়ী মালদা জেলার মোট জনসংখ্যা ২০.৩৫,০০৯, তার মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ১০,৪৩,৬৩৪ জন আর মহিলার সংখ্যা ৯,৯১,৩৭৫ জন। গত কয়েক দশকের জনসংখ্যার হিসাব দেওয়া হলো।

বছর	জনসংখ্যা	হ্রাস-বৃদ্ধির সংখ্যা	হ্রাস-বৃদ্ধির%
১৯০১	৬,০৩,৬৪৯	—	—
১৯১১	৬,৯৮,৫৭৪	+৯৪,৮৯৬	১৫.৭২
১৯২১	৬,৮৬,১৭৪	—.২,৩৭০	—১.৭৭
১৯৩১	৭,২০,৪৪০	+৩৪,২৬৬	+৪.৯৯
১৯৪১	৮,৪৪,৩১৫	+১,২৩,৮৭৫	+১৭.১৯
১৯৫১	৯,৩৭,৫৮০	+৯৩,২৬৫	+১১.০৫
১৯৬১	১২,২১,৯২৩	+২,৮৪,৩৪৩	+৩০.৩৩

ধর্ম : মালদা জেলায় প্রধানত মুসলমান এবং হিন্দু এই দুই ধর্মের লোক দেখতে পাওয়া যায়। জেলায় খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বী লোকও আছে। মাঝে মধ্যে দু-এক ঘর জৈনও দেখতে পাওয়া যায়।

জেলার সদর মহকুমা ইংলিশবাজার থানায় প্রচুর উচ্চবর্ণ হিন্দু বাঙালী দেখা যায়। বাংলা ভাগের অনেক আগে থেকেই বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে কাজকর্মের খোঁজে হিন্দু বাঙালীরা এখানে আসতে শুরু করে। এখনও তাদের আসার গতি অব্যাহত রয়েছে। গ্রামাঞ্চলে নিম্নবর্ণের হিন্দুদের বাস।

অন্যান্য জাতি : নিম্নবর্ণ নমশূদ্র দীং হিন্দুদের মধ্যে আছে নাগর-ধানুক-চাঁই প্রভৃতিরা। কালিয়াচক অঞ্চলে বেশ কিছু ঘোষও দেখতে পাওয়া যায়।

একসময় বিহার থেকে এসে দিয়ারার চরে বা বরিন্দের গঞ্জে ঘর বেঁধেছিল একদল মানুষ। এদের খোট্টা বলা হয়। এরাও ধর্মে হিন্দু। দিয়ারা এবং টালের বিস্তৃত জমি ধরে মৈথিল ব্রাহ্মণদের বাস। এদেরও আদি বাস বিহার।

ইংলিশবাজার শহরে কিছু মাড়োয়ারীও বসবাস করে, তারা এসেছিল ব্যবসায়ের সূত্রে। বহুদিন থাকার ফলে সাংস্কৃতিক সংমিশ্রণের মধ্য দিয়ে এই মাড়োয়ারীরাও আচার আচরণে বাঙালী বনে গেছে। এরা দুভাগে বিভক্ত—আগরওয়ালা এবং মাহেশ্বরী। আগরওয়ালারা জৈন আর মাহেশ্বরীরা হিন্দু।

জেলার বরিন্দ এলাকায় প্রচুর আদিবাসী রয়েছে। তাদের মধ্যে সাঁওতাল, রাজবংশী, পলিয়া, কোচ, মুণ্ডা, ওঁরাও প্রভৃতিরা বিখ্যাত। সাঁওতালরা ধর্মের দিক দিয়ে চারটি দলে বিভক্ত—খেরোয়ার, সাঁওতাল, হিন্দু এবং খ্রীষ্টান। খ্রীষ্টানদের মধ্যে আবার ক্যাথলিক এবং প্রটেষ্টাণ্ট এই দু-ধরনের খ্রীষ্টানই দেখতে পাওয়া যায়। রাজবংশী, পলিয়া, মুণ্ডা, ওঁরাও—এদের অধিকাংশই হিন্দু ধর্মাবলম্বী।

জেলার দিয়ারা এলাকার কিয়দংশে বাদিয়া মুসলমানদের বাস।

দিয়ারা ও টালের অন্তর্গত রতুয়া, ইংলিশবাজার এবং মানিকচক থানায় কয়েকটি অভিজাত মুসলমান পরিবার বসবাস করেন। এরা এসেছিলেন বিহারের দ্বারভাঙ্গা অঞ্চল থেকে। এছাড়া জেলার বিভিন্ন স্থানে পাঁঝরা, কুঁঝড়া, মোমিন প্রভৃতি নানা সম্প্রদায়ের মুসলমান অধিবাসী রয়েছে।

ভাষা : মালদা জেলার মানুষ মুলত বাংলা ভাষায় কথা বলে। গ্রাম-অঞ্চলের দিকে গেলেই কিন্তু বিহারী কথার টান শোনা যায়। মৈথিল ব্রাহ্মণরা হিন্দী এবং বাংলা ভাষা মিশিয়ে এক মিশ্র ভাষায় কথা বলে। মৈথিল অধ্যুষিত এলাকায়, বিশেষত মানিকচক ও রতুয়া থানার তথা-কথিত নিম্নবর্ণের হিন্দুরা এবং মুসলমানরাও ঐ একই ভাষায় কথা বলে।

হিন্দী আর বাংলা মেশানো এই কথ্য ভাষাকে মালদায় খোট্টা ভাষা বলা হয়।

টাল-দিয়ারার অভিজাত মুসলমানরাও খোট্টা ভাষাতে কথা বলে। তবে তাদের ভাষা আর মৈথিলদের ভাষার মধ্যে সামান্য তফাত আছে। মৈথিলদের ভাষাতে ভোজপুরী ভাষার প্রভাব সুস্পষ্ট। আর অভিজাত মুসলমানদের কথায় উর্দুর টান ধরা পড়ে।

আদিবাসী সাঁওতাল বা কোচেরা তাদের নিজেদের ভাষাতেই কথা বলে।

মালদা জেলার বাংলাভাষী লোকদের কথাতেও একটা টান শোনা যায়। বাক্যের প্রথম এবং শেষ শব্দটি তারা টেনে অনেকক্ষণ পর্যন্ত উচ্চারণ করে। মালদা জেলার গ্রামাঞ্চলে যারা নিপাট বাংলা বলে, তাদের কথাতেও বিহারী প্রভাব রয়েছে। যেমন আমি কে হামি, আমারকে হামার ইত্যাদি। একসময় মালদা জেলার বেশ কিছু অঞ্চল বিহার রাজ্যের পূর্ণিয়া জেলার সন্নিকটবর্তী ছিল বলেই হয়তো কথার ভাঁজে বিহারী প্রভাব এখনও বর্তমান।

বিভিন্ন কৌম গোষ্ঠী

ধর্ম সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে, প্রসঙ্গত বেশ কিছু কৌম গোষ্ঠীর কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। এই সব কৌম গোষ্ঠীর জীবনযাত্রা, আচার আচরণ, প্রথা সম্পর্কে কয়েকটা কথা বলার প্রয়োজন আছে।

সাঁওতাল: মালদা জেলার কৃষিজীবী অমুসলমানদের মধ্যে প্রথমেই নাম করতে হয় সাঁওতালদের। আগেই বলা হয়েছে যে ধর্মের দিক দিয়ে এরা চারটি ভাগে বিভক্ত: খ্রীষ্টান, হিন্দু, খেরোয়ার এবং সাঁওতাল। খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বী সাঁওতালদের সংখ্যা খুব বেশী নয়। তারা যে সব এলাকায় বসবাস করে সেখানে কয়েকটি ছোটখাটো গীর্জা আছে। হিন্দু সাঁওতালদের সত্যম শিবম সম্প্রদায়ের লোক বলা হয়। এই সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়েছে ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দের কাছাকাছি কোন সময়ে। দিনাজপুর

জেলার কাশীশ্বর চক্রবর্তী নামে এক ভদ্রলোক এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা সত্যম শিবম্ সম্প্রদায়ের সাঁওতালরা শুকর বা মুরগী খায় না।

বিহার রাজ্যের এক হিন্দু ধর্মনেতা খেরোয়ার সাঁওতাল সম্প্রদায় সৃষ্টি করেছেন। এই সম্প্রদায়ের সাঁওতালদের গায়ের রং অন্যান্য সাঁওতালদের থেকে কিছুটা ফর্সা। এরা মাংস এবং পচাই খায় না। এছাড়া সাধারণ সাঁওতালদের সাথে তাদের বিশেষ কোন তফাত নেই।

সাধারণ সাঁওতালরা মোট ১২টি গোত্রে বিভক্ত—মুর্মু, কিস্কু, হেমব্রোম, হাঁসদা, সোরেণ, টুডু, বেসরা, বাস্কে, চোবে, বেদিয়া ও পাউরিয়া। এগুলোই তাদের গোত্র। একই গোত্রের সাঁওতাল ছেলে সেই গোত্রের মেয়েকে বিয়ে করতে পারে না। অন্য গোত্রের সাথেই কেবল বৈবাহিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

সাঁওতালরা দলবদ্ধ হয়ে বাস করতে ভালবাসে। উৎসব অনুষ্ঠানে মাথায় লাল ফুল গোঁজা সাঁওতালি মেয়েদের বৈশিষ্ট্য। সামাজিক অনুষ্ঠানগুলো পালিত হয়—সাঁওতাল সর্দারদের নির্দেশ অনুযায়ী। সাঁওতালদের সর্দারকে বলা হয় মাঝি। সকলেই মাঝির নির্দেশ পালন করে চলে। মাঝির আদেশ না মানলে শাস্তি ভোগ করতে হয়। সাঁওতালরা তাদের শিকারের জন্য এবং আত্মরক্ষার জন্য তীর ধনুক ব্যবহার করে।

কোনো সাঁওতাল ছেলে বা মেয়ে জন্মগ্রহণ করলে জন্মের পর তৃতীয় বা পঞ্চম দিনে একটি অনুষ্ঠান হয়। এই অনুষ্ঠানকে বলা হয় নাপ্‌তা। বংশের প্রথম ছেলের নাম রাখা হয় তার ঠাকুর্দার নাম অনুসারে। পিতামহীর নাম পায় বংশের প্রথম মেয়ে। নামকরণ পর্ব চুকে গেলে সকলকে ফুল জল ছেটানো হয়। তারপর উপস্থিত অতিথিরা নিমপাতার গুড়ো দিয়ে সেদ্ধ করা ভাত খায়। সন্তানের পাঁচবছর বয়স হলে, আরেকটি অনুষ্ঠান পালিত হয়। এই অনুষ্ঠানের নাম সাখী। মেয়েদের বুকে বা কোনো একটি হাতে রেখাঙ্কনের পদ্ধতি প্রচলিত আছে।

সাঁওতালদের মধ্যে ঘটকের সাহায্যে বিয়ে ঠিক করার রেওয়াজ আছে। আবার কোন ছেলে বা মেয়ে নিজেরাই পাত্রপাত্রী পছন্দ করে নিতে পারে। বিয়ে নাকচ করার ক্ষমতা কেবলমাত্র মাঝিরই আছে। বিয়ের রীতিতে এখনও নারীহরণ পদ্ধতি রয়েছে। তবে এখন তাতে আধুনিকতার ছোঁয়া লেগেছে। এখন আগে থেকেই মেয়ে পছন্দ হয়।

তারপর মেয়ে পক্ষ যায় কাছের কোন গঞ্জে বা হাটে। ছেলে পক্ষ ওখানে গিয়ে কন্যাকে হরণ করে। কন্যা হরণ করার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধের একটা অভিনয় চলে। সবশেষে, কন্যা বিজয়ী বীরের গলায় বরমাল্য তুলে দেয়। তারপর একদিন বিয়ে হয় এবং সামাজিক ভোজ হয়। প্রাকবিবাহ যৌন মিলনে সাঁওতালদের মধ্যে কোন সামাজিক বাধা নেই। কন্যা গর্ভবতী হলে সন্তান ভূমিষ্ঠ না হওয়া পর্যন্ত বিয়ে হয় না।

নিজেদের সুবিধামত সাঁওতালরা মৃতদেহ দাহ করে বা কবর দেয়। কাঠ সংগ্রহ করতে পারলে মৃতদেহ দাহ করাই তারা পছন্দ করে। কোন সাঁওতাল মারা গেলে, গ্রামের সব সাঁওতালই উপস্থিত থেকে মৃতের প্রতি শ্রদ্ধা জানায়।

অধিকাংশ সাঁওতালই কৃষিজীবী। তাদের কেউ বা আধিয়ার, কেউ বা ক্ষেতমজুর। আবার কিছু সাঁওতাল ছেলে প্রায়ই তীরধনুক এবং কুকুর সঙ্গে নিয়ে শিকারে বের হয়। সঙ্গে মুড়ি চিঁড়ে ইত্যাদি বেঁধে নিয়ে যায়। তিনচার দিন বাড়ির বাইরে থেকে, ঐ মুড়ি, চিঁড়ে দিয়েই ক্ষুন্নিবৃত্তি করে, খরগোস, সাপ, ইঁদুর, পাখী প্রভৃতি শিকার করে তারা ঘরে ফিরে আসে।

এই সাঁওতালরা মালদা জেলায় এলো কোথা থেকে? আর কেনই বা এলো? এই নিয়ে বিভিন্ন মত প্রচলিত আছে। তার মধ্যে দুটো মতই গুরুত্বপূর্ণ। একটি হচ্ছে যে—উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে নীলকুঠির সাহেবরা, নীল তৈরির কারখানাতে শ্রমিক হিসেবে কাজ করানোর জন্য, বিহারের ছোটনাগপুর অঞ্চল থেকে প্রচুর সাঁওতাল এনেছিল। সাহেবরা তাদের লাভের হারকে চড়া করবার জন্যই দারিদ্র্য কবলিত আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকা থেকে সস্তায় শ্রমিক আমদানী করেছিল।

মালদা জেলায় সাঁওতালদের বসতি গড়ে ওঠার আর একটি কারণও রয়েছে। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে বিহারের সাঁওতাল পরগনায়, সাঁওতালরা ঔপনিবেশিক শাসন এবং সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল। ফলে অকথ্য সরকারী দমন পীড়ন নেমে এসেছিল তাদের ওপর। যখন সরকারী অত্যাচারের চাপে, সাঁওতালদের প্রতিরোধ ভেঙে পড়েছিল, তখন বেশ কিছু সাঁওতাল এদিক ওদিক পালিয়ে গিয়ে

তাদের প্রাণ বাঁচিয়েছিল। একদল বিদ্রোহী সাঁওতাল এই ভাবেই প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে মালদা জেলায় এসে বসতি গড়েছিল।

রাজবংশী : সংখ্যায় সাঁওতালদের পরেই রাজবংশীদের স্থান। তারা বলে যে তারা কোচবিহারের রাজার বংশোদ্ভূত। আবার কারুর মতে রাজবংশীদের আদি বাসস্থান ছিল কামরূপ। খেমদের আগে নাকি কামরূপের শাসনকর্তা ছিল রাজবংশীরাই। যাই হোক, এগুলোর সত্যতা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। তবে মালদার রাজবংশীরা যে ভোটবর্মী বা মোঙ্গলিয়ান গোষ্ঠীর লোক, তা তাদের চেহারা দেখলেই বোঝা যায়। কোন কোন রাজবংশী যজ্ঞোপবীত ধারণ করে। তাদের পদবীও বৈচিত্রপূর্ণ। তাদের মধ্যে কেউ কেউ আবার সিংহ, সিংহরায় এবং সরকার পদবীও গ্রহণ করেছে। রাজবংশীরা সাধারণত বঙ্গাল নামে পরিচিত। যে এলাকায় তাদের বাস, সেই এলাকাকে বঙ্গাল পাড়া বলা হয়। রাজবংশীদের দলপতিকে বলা হয় মহৎ আর মণ্ডল, মহৎরা নির্বাচিত হয় তাদের গোত্র থেকে। আর মণ্ডলদের মনোনীত করে ভূস্বামীরা। কুড়িজন মহতের ওপর একজন রাজা থাকে। কোন মহতের ওপর অসন্তুষ্ট হলে সাধারণ রাজবংশীরা এই রাজার কাছে নালিশ জানায়। রাজার একজন দেওয়ান থাকে। দেওয়ান আবার একজন বারিক মারফত অভিযুক্ত মহতের বিচার করে। কৃষিকার্যে রাজবংশীরা বিশেষ পটু। তরিতরকারী এবং তামাক ফলনে এদের দক্ষতা অনস্বীকার্য। রাজবংশীদের মধ্যে নিকা প্রথা এবং বিধবা প্রথা চালু আছে। তাছাড়া রয়েছে ডাঙ্গুয়া প্রথা—অর্থাৎ মেয়েদের পছন্দ মত পুরুষ রাখার প্রথা। বর কনের বাবাকে যৌতুক দেয়। তাছাড়া কনে বাড়ির ভোজের খরচও বরকেই দিতে হয়।

মহাযান মতাবলম্বী বৌদ্ধ ধর্ম, হিন্দু ধর্ম আর বৈষ্ণব ধর্ম একত্রিত হয়ে রাজবংশীদের মধ্যে একটা নতুন ধর্ম সৃষ্টি হয়েছে। তবে অধিকাংশ রাজবংশীরাই বৈষ্ণব।

পলিয়া : পলিয়ারা দুভাগে বিভক্ত। সাধু পলিয়া এবং বাবু পলিয়া। বাবু পলিয়াদের আচার আচরণ অনেকটা রাজবংশীদের মতই। সাধু পলিয়াদের আচার আচরণ আবার অন্য ধরনের। এরা নিরামিষভোজী,

সাধু পলিয়ারা নিজেদের ক্ষত্রিয় বলে দাবী করে এবং যজ্ঞোপবীত ধারণ করে। এদের মধ্যে বিধবা বিবাহের প্রচলন নেই। এরা মোটামুটি ভাবে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের আচার অনুষ্ঠান মেনে চলার চেষ্টা করে। তামাশা করে বলা হয় যে কোন একসময় এরা যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল। তার থেকেই না কি তাদের পালিয়া বা পলিয়া বলা হয়।

দেশী : দেশীরা নিজেদের গৌড়দেশী হিসেবে পরিচিত করে। সম্ভবত গৌড়রাজ্যের পতনের পর এদের পূর্বপুরুষেরা গৌড়ের কাছাকাছি কোন জায়গায় বসবাস শুরু করেছিলেন। এদের রীতিনীতি অনেকটাই রাজ-বংশীদের মত।

কোচ : ভোটবর্মী বা মঙ্গোলীয় গোষ্ঠীর অধিবাসীদের মধ্যে কোচেরাই সব থেকে অনুন্নত এবং অনগ্রসর। এরা শিবের উপাসক। পূজাপার্বনে এরা কবুতর বলি দেয় এবং তার রক্ত পান করে। এদের মধ্যে এখনও বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত আছে।

বাদিয়া : কালিয়াচক, মানিকচক এবং রতুয়া থানা অঞ্চলে বাদিয়াদের বাস। এদের শেবশাবাদিয়া বলা হয়। মালদাই উচ্চারণে এদের শির্শা-বাদিয়া বলা হয়। কারুর মতে এরা পাঠানরাজ শেরশাহের বংশোদ্ভুত। তাই এদের শেরশাবাদিয়া বলা হয়। কেউ কেউ বলেন শেরশাহ্ মোগল সম্রাট হুমায়ুনকে যখন পরাস্ত করে গৌড় থেকে বিতাড়িত করেছিলেন, তখন শেরশাহের সৈন্য হিসাবে বাদিয়ারা গৌড়ে এসেছিল। এদের আদি বাসস্থান ছিল আফগানীস্থানের উষর অঞ্চলে। তার থেকেই বাদিয়ারা শেরশাবাদিয়া হিসেবে আখ্যায়িত। আবার আরেকদল পণ্ডিতের বক্তব্য একটু অন্যরকম। এরা শেরশাহের সাথেই গৌড়ে এসে আবাদ বা বসতি গড়ে তুলেছিল। তাই ঐ অঞ্চলের নাম হয়েছিল শেরশাহ্‌বাদ, শেরশাহ্‌বাদ পরগণার অধিবাসীরাই নাকি শেরশাবাদিয়া।

বাদিয়ারা ধর্মে মুসলমান। তবে মুসলমান ধর্মের কোন মতধারাকে এরা অনুসরণ করে, তাই নিয়ে দুধরনের বক্তব্য প্রচলিত আছে। একটি বক্তব্য হলো যে এরা অধিকাংশই হানিফী সম্প্রদায়ের মুসলমান। অন্য মতটি বলে যে হানেফি, শাফেয়ি, মালেকি ও হাম্বলী—মুসলমান ধর্মের এই চারটি মতধারার মধ্যে এরা কোনটাই অনুসরণ করে না। এরা বলে

এরা নাকি খোদ মহম্মদীয় মতের অনুসারী। এরা নিজেদের লা-মজহাবী বলে পরিচয় দেয়। এই কথার অর্থ হলো, এরা প্রচলিত এই চারটি সম্প্রদায়ের বাইরে। মজহব্ মানে ধর্ম এবং লা মানে নয়। বাদিয়াদের ধর্ম বিশ্বাস সম্পর্কে প্রচলিত এই দুটি মতবাদের মধ্যে শেষেরটিকে সঠিক বলে মনে হয়।

পাঁঝরা : এরা মাছের ব্যবসায়ে লিপ্ত। ধর্মের দিক দিয়ে এরা মুসলমান। এদের মেয়েদের মধ্যে সিঁদুর পবার চল আছে।

কুঁঝড়া : এরাও ধর্মে মুসলমান। এরা কথা বলে খোট্টা ভাষায়।

মোমিন : কালিয়াচক থানার বিস্তীর্ণ এলাকা ধরে মোমিন সম্প্রদায়ের মুসলমানদের বাস। এদের জোলাও বলা হয়। এদের আদি পেশা ছিল তাঁতের কাজ করা। বাদিয়া, পাঁঝড়া, কুঁঝড়া মোমিন ছাড়াও মালদা জেলায় শেখ সম্প্রদায়ের মুসলমানরা বাস করে। এরা অভিজাত মুসলমান হিসেবে পরিগণিত হয়।

মৈথিল : দিয়ারা ও টালের দীর্ঘ ভূমিরেখা ধরে মৈথিল ব্রাহ্মণদের বাস। বলা হয় যে, মানসিংহের গৌড় অভিযানের সময়, এরা সৈনিক হিসেবে এসেছিল। এদের আদি বাসস্থান বিহারের মিথিলা অঞ্চল।

নাড়েগুস্তি : মহানন্দা নদীর পশ্চিম অংশে মুসলমান ধর্মাবলম্বী একদল লোক রয়েছে, যাদের বলা হয় নাড়েগুস্তি। শোনা যায় যে আগে এরা নদীয়া জেলায় বসবাস করতো। তারা হিন্দু ধর্মাবলম্বী ছিল। কিন্তু বহু শতাব্দী পূর্বে এরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। তাবপর নদীয়া ত্যাগ করে তারা রাজশাহী জেলার নাটোর অঞ্চলে এসে উপস্থিত হয়। কিন্তু তাদের বসতি গড়ে ওঠার মত, প্রচুর জমি নাটোর অঞ্চলে ছিল না। তখন তারা রাজশাহী জেলা থেকে গৌড় এবং পাণ্ডুয়া অভিমুখে যাত্রা করে এবং মালদা জেলায় বসতি গড়ে তোলে। উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এদের মালদা জেলায় অনুপ্রবেশ ঘটেছিল বলে ধরা হয়। যদিও এরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল, তবুও এখনও এদের মধ্যে কিছু কিছু হিন্দু রীতিনীতি প্রচলিত আছে। যেমন এরা উৎসবে এবং পূজা পার্বনে আলপনার ব্যবহার করে। প্রতি বৈশাখ মাসে এরা বুড়িমা নামে এক দেবীকে পূজো দেয়।

৪

জীবনযাত্রার উপকরণ

ঘরবাড়ি

মালদা জেলার শহরাঞ্চলে পাকা দালান দেখা যায়। শহরাঞ্চলে অধিকাংশ বাড়িই ইট আর সিমেন্ট দিয়ে তৈরি। গ্রামের দিকে মাটির ঘর দেখা যায়। টালির ছাউনি, পাতার ছাউনি, খড়ের ছাউনি দিয়ে এই মাটির ঘরগুলো তৈরি। ইদানীং আজবেস্টসের ছাউনিরও চল হয়েছে। গ্রামের দিকে ধনী কৃষক বা জোত্‌দাররা অনেক সময়ে পাকা দালানে থাকে।

মালদা জেলার পুরনো মালদা (Old Malda) থানায় বিশেষ ধরনের বাড়ি দেখা যায়। অনেকগুলো বাড়ির ছাদ একসঙ্গে লাগানো। অর্থাৎ অনায়াসেই এক বাড়ির ছাদ থেকে অন্যবাড়ির ছাদে হেঁটে চলে যাওয়া যায়। কিন্তু নিচে নামলে এক বাড়ির সাঙ্গে আরেকটি বাড়ির কোন সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায় না। লোকমুখে শোনা যায়, আসলে নাকি এই বাড়িগুলো, মধ্যযুগে এক একটা বড় দুর্গ ছিল। আগেই বলা হয়েছে, সুলতানি আমলে এবং মোগল যুগে বর্তমানের ওল্ড মালদা শহর বিভিন্ন দিক দিয়ে যথেষ্ট গৌরব এবং গুরুত্ব অর্জন করেছিল। আর এই গুরুত্বপূর্ণ নগরীকে শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্যই বড় বড় দুর্গ তৈরি হয়েছিল। তারপর রাজা বাদশাদের যুগ শেষ হয়ে যাবার পর যখন ঔপনিবেশিক যুগ আরম্ভ হলো, তখন পুরনো মালদা তার পুরনো গৌরব হারাতে শুরু করলো। পাশের শহর ইংরেজবাজারের শ্রীবৃদ্ধি ঘটতে লাগল। ইংরেজরা তাদের ঔপনিবেশিক স্বার্থ রক্ষার তাগিদে ইংরেজ-বাজারেই তাদের অফিস, আদালত এবং বাণিজ্যকেন্দ্রগুলি গড়ে তুললো, পুরনো মালদা শহরের গুরুত্ব যদিও গেল কমে, এর জনবসতি গেল বেড়ে। কারণ পাশের শহর ইংরেজবাজার। ইংরেজবাজারের সরকারি

অফিসের এবং হৌসের অনেক বাবুই ইংরেজবাজার ছাড়াও বাসা বাঁধলো ওল্ড মালদা শহরে। তখনই এই দুর্গগুলিকে তারা বসতবাড়ি হিসাবে ব্যবহার করতে লাগলো। সুবিধামত দেয়াল তুলে নিল। কিন্তু ছাদ রয়ে গেল একটাই। তাই অনায়াসেই একবাড়ির ছাদ থেকে অন্যের ছাদে চলে যাওয়া যায়।

ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি : মালদা জেলায় এখনও চাষের কাজে, কুমোরের কাজে, কামারের কাজে সাবেককালের যন্ত্রপাতিই ব্যবহৃত হয়। তাই এর সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার কোনো প্রয়োজন নেই। কৃষির ক্ষেত্রে অবশ্য কিছু কিছু নতুন যন্ত্রপাতির আমদানি হয়েছে। পরে কৃষিসম্পর্কিত আলোচনার সময়, এ বিষয়ে কয়েকটা কথা বলা যাবে। বিভিন্ন কাজের জন্য ব্যবহৃত যন্ত্রপাতিগুলো, মালদা জেলায় স্থানীয় পর্যায়ে তৈরি হয়।

বেশবাস : মালদার শহর-অঞ্চলের লোকজনেব পোশাকে বিশেষত্ব কিছুই নেই। পুরুষেরা শার্ট, ধুতি, পাঞ্জাবি এবং মেয়েবা শাড়ি, সায়া, ব্লাউজ ব্যবহার করে, গ্রামের দিকে পুরুষেরা ধুতি বা লুঙ্গি পরে। তারা সাধারণত খালি গায়ে থাকে। কখনও বা গায়ে জামা বা গেঞ্জি চাপায়। মহিলাদের মধ্যে ব্লাউজ পরার রীতি নেই বললেই চলে, তবে এক-এক সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে এক-এক বিশেষ ধরনের পোশাকের ব্যবহাব দেখা যায়। যেমন সাঁওতালরা এক টুকরো কাপড় হাঁটু পর্যন্ত পরে। তাদের ঊর্ধ্বাঙ্গ সাধাবণত অনাবৃতই থাকে। সাঁওতাল মেয়েরা পরে ডোরাকাটা এক-টুকরো কাপড় লুঙ্গির মতো করে। এতে কোনো সেলাই থাকে না। ঊর্ধ্বাঙ্গে ওড়নার মতো আর এক টুকরো কাপড় থাকে। এরা সাধারণত জুতো ব্যবহার করে না। ইদানীং একদল সাঁওতালের গায়ে শহুরে হাওয়া লেগেছে। এদের মেয়েরা, শাড়ি, সায়া, ব্লাউজ প্রভৃতি ব্যবহার করতে শুরু করেছে। আর ছেলেরা হাঁটু পর্যন্ত কাপড় পরার রীতি পরিত্যাগ করে ট্রাউজার, বুশশার্ট, পাজামা, পাঞ্জাবি প্রভৃতি ব্যবহার করতে শুরু করেছে।

রাজবংশী পুরুষেরা হাঁটু পর্যন্ত কাপড় পরে এবং গায়ে থাকে

গামছা, তবে ক্ষেতখামারে যারা মেহনতের কাজ করে এটা তাদেরই পোশাক। যে সমস্ত রাজবংশী লেখাপড়া শিখে শহরাঞ্চলে চাকরি করে, তারা পাঞ্জাবি ছাড়াও প্যাণ্ট শার্ট প্রভৃতি ব্যবহার করে। রাজবংশী মেয়েরা বুকের ওপর গিঁট দিয়ে হাঁটু পর্যন্ত বিস্তৃত এক ধরনের কাপড় পরে। এই পোশাকটাকে বলা হয় ঠেঁট। এর রং হয় সাদা। রাজবংশী মেয়েরা নিজেরাই এই পোশাক বুনে নেয়।

শেরশাবাদিয়া সম্প্রদায়ের মুসলমান ছেলেরা পরে চেক লুঙ্গি, চাদর, আর ঢোলা হাতা পাঞ্জাবি। বাদিয়া মেয়েরা পরে ঠেঁঠি, কাপা ও চাদর। কাপা অনেকটা লুঙ্গির মতো। এরা সাধারণত নীল ও সবুজ কাপা ব্যবহার করে। বাদিয়া ছেলেরা সাধারণত কাঁধে গামছা রাখে। আর যারা কিঞ্চিৎ বিত্তবান, তারা গামছার জায়গায় কাঁধে রাখে তোয়ালে। মাঝে মধ্যে, বিশেষত ধর্মীয় কারণে এরা ফেজ্ বা সাদা টুপি ব্যবহার করে।

অভিজাত মুসলমানেরা পাজামা পাঞ্জাবি পরে। যদিও এখন এদের মধ্যে প্যাণ্ট শার্টের চলই বেশি, এদের মেয়েরা শাড়ি, সায়া, ব্লাউজ, শালওয়ার কামিজ সব কিছুই পরে।

উৎসব অনুষ্ঠান ও মেলা : Hunter সাহেবের Statistical Accounts of the District of Malda থেকে আমরা অনেকগুলো উৎসব অনুষ্ঠান ও মেলার কথা জানতে পারি। অন্তত ছ'টা গুরুত্বপূর্ণ মেলার বর্ণনা তিনি দিয়েছেন। আমরা ধরে নিতে পারি যে, উনিশ শতকের শেষদিকে মালদা জেলায় Hunter-বর্ণিত মেলাগুলো মালদার জনজীবনে বেশ গুরুত্ব লাভ করেছিল।

Hunter দেখেছিলেন জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষদিনে গৌড়ের কাছে বসত রামকেলি মেলা। দোলযাত্রায় ঠিক বারো দিন পরে গর্গরিবা অঞ্চলে বসত কুরীশ মেলা। ঠিক একই দিনে বসত কানসাট নামে জায়গায় কানসাট মেলা। বর্তমানে গর্গরিবা এবং কানসাট—এই দুই অঞ্চলই চলে গেছে বাংলাদেশে। সুতরাং এখনও এই দুটি মেলা প্রচলিত আছে কিনা, তা সঠিক জানা যায় না। ইংরেজবাজার থানার ঠিক দশ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত টুটা জঙ্গল। এই টুটা জঙ্গলে তুলসীবিহারী মেলা নামে একটি

মেলা বসতো, বৈশাখ মাসের শেষ দিনে। এই অঞ্চলে কিছু ব্রাহ্মণ বাস করতো। যারা কখনোই দার পরিগ্রহ করত না এবং সর্বদাই তারা মহিলা-দের সাজে সজ্জিত থাকতো। তারা দাবি করতো যে, তারা শ্রীকৃষ্ণের গোপিনী। এই মেলার দিনটিতে তারা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হত। পাণ্ডুয়া অঞ্চলে পেরুয়া মেলা নামে মুসলমানদের একটি মেলা হতো। বামনগোলাতে চৈত্র মাসে মুসলমানদের আর একটি মেলা হতো, যার নাম পোওয়াল মেলা।

আজও মালদার গ্রামেগঞ্জে বিভিন্ন উৎসবকে উপলক্ষ করে প্রচুর মেলা বসে। মালদা জেলার সবগুলো মেলার বিবরণ এই স্বল্প পরিসরে দেওয়া সম্ভব নয়। যে মেলাগুলো খুব বেশি জনপ্রিয় এবং মালদার জনজীবনে যে মেলা বা উৎসবগুলো গুরুত্ব পেয়েছে সেগুলোই কেবল আলোচনা করা হচ্ছে।

Hunter-এর লেখায় যে রামকেলি মেলার উল্লেখ আমরা পেয়েছি সেই মেলা আজও বসে। সাতদিন ধরে এই মেলা চলে। লোকমুখে শোনা যায় মেলাটি প্রায় সাড়ে চারশো বছরের প্রাচীন।

কোজাগরী পূর্ণিমায় নৌকা প্রতিযোগিতা উপলক্ষে কোতয়ালি ও আড়াপুরে বাইচের মেলা বসে, মুসলমান ও হিন্দু উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরই সমাবেশ হয় এই মেলাতে। মেলাটি প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে হয়ে আসছে।

কোতয়ালি-অঞ্চলে মাঘ মাসের প্রতি রবিবার মেয়েরা সূর্যব্রত পালন করে। এই সূর্যব্রতকে উপলক্ষ করে মাঘ মাসের প্রথম রবিবার কোতয়ালি অঞ্চলে একটি মেলা বসে।

নরহাট্টায় প্রায় বিঘা তিনেক জমির ওপর প্রতিবছর সিরুয়া উৎসবের মেলা বসে, প্রতিবছর জ্যৈষ্ঠ মাসে সাতুল্লাপুরে ভাগীরথীর তীরে এক-দিনের জন্য বসে দশহরা স্নানের মেলা।

গম্ভীরা পূজার মেলা মালদা জেলায় এক বিশেষ আকর্ষণ। হবিবপুর থানার জোতগোকুল গ্রামে, রতুয়া থানার ফরিদপুর ও বেরুল গ্রামে গম্ভীরা পূজার মেলা বসে প্রতি বৈশাখ মাসে। খরবা থানার ক্ষেমপুর গ্রামেও এই মেলা বসে।

হবিবপুর থানার বুলবুলচণ্ডী গ্রাম থেকে ছয় মাইল দূরে সজনাদীঘি

গ্রামে সাঁওতালরা প্রতি বছর ফাল্গুন মাসে একটি মেলার আয়োজন করে। ফাল্গুন সংক্রান্তির রাতে এই মেলার সূচনা হয়। মেলায় একটি ছাতা উঁচু করে বেঁধে রাখা হয়। সাঁওতালরা চাঁদের আলোয় লক্ষ্য স্থির করে ঐ ছাতাকে তীরবিদ্ধ করে। তারপরই মেলা শুরু হয়।

এছাড়া মানিকচক থানার ধরমপুর গ্রামে প্রতি বৈশাখে বাশুলী পূজার মেলা, হরিশ্চন্দ্রপুর থানার গোহিল গ্রামে গোহিলচণ্ডী পূজার মেলা এবং গাজোল থানার ধাওয়াইল গ্রামে কংসব্রতর মেলাগুলোও খুবই বিখ্যাত।

মালদা জেলার বিভিন্ন জায়গায় মহরম উপলক্ষে মেলা বসে। তবে রতুয়া থানার খৈলসনা গ্রামের এবং খরবা থানার কোবাইয়া গ্রামের মহরমের মেলা সব থেকে বিখ্যাত।

গাজোল থানার অন্তর্গত পাণ্ডুয়া গ্রামে মুসলমান সম্প্রদায়ের লোকেরা প্রতি বছর সব্-এ-বরাত উপলক্ষে একটি মেলার আয়োজন করে। সাত দিন ধরে এই মেলা চলে। লোকমুখে শোনা যায় যে মেলাটি নাকি আটশো বছরের পুরোনো। খুব সম্ভবত, সব্-এ-বরাতের মেলাই হচ্ছে Hunter-কথিত পেরুয়া মেলা। পাণ্ডুয়াতে বাইশ হাজারী এবং ছয় হাজারী নামে দুটো বড় মেলা বসে। এই মেলা দুটিও খুবই প্রাচীন।

মালদা জেলার সাঁওতালদের মধ্যে বাঁধনা-উৎসব খুবই জনপ্রিয়। যদিও এই উৎসব উপলক্ষে কোনো মেলা বসে না, তবুও এই উৎসবে সমস্ত সাঁওতালই যোগদান করে। মাঘ মাসের যে কোনো একটি দিনেই এই উৎসব শুরু হয়। তিন দিন ধরে এই উৎসব চলে। মাদল বাজিয়ে নাচ-গান করে এই আনন্দোৎসব অতিবাহিত করে সাঁওতালরা।

৫

কৃষি

মালদা জেলার ভূমি-ব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত পটভূমিকা : মুর্শিদকুলি খাঁর ভূমি-বন্দোবস্ত অনুযায়ী বর্তমানের মালদা জেলা ছিল দিনাজপুর ও রাজশাহীর জমিদারির অধীনে এবং পূর্ণিয়া ফৌজদারীর মধ্যে। মুর্শিদকুলির সময়কার নথিপত্র থেকে জানা গেছে যে বর্তমান মালদা জেলার কয়েকটি মহলের জমার (সরকারকে দেয় রাজস্ব) পরিমাণ ছিল বেশ অল্প। এর কোনো সঙ্গত কারণ খুঁজে পাওয়া যায়নি। আদৌ তৎকালীন মালদা কোনো গুরুত্বপূর্ণ কৃষি-অঞ্চল হিসেবে গড়ে ওঠেনি, না এর পিছনে অন্য কারণ বর্তমান ছিল, এ বিষয়ে গবেষণার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর কিছু নথিপত্র উল্টেপাল্টে দেখলে হয়তো অনুমান করা অসঙ্গত হবে না যে, মালদায় কৃষিকাজ যথেষ্ট গুরুত্ব পেয়েছিল অপেক্ষাকৃত দেরিতে—উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে। ১৮৫৫ খ্রীস্টাব্দে সাঁওতাল বিদ্রোহ দমনের পর প্রচুর সাঁওতাল প্রাণ বাঁচাতে মালদা জেলায় আশ্রয় নিয়েছিল। ফলে ক্ষেত-মজুরের সমস্যার কিঞ্চিৎ সমাধান হয়তো হয়েছিল। জনৈক সরকারি আমলা Cotterel সাহেবের Report থেকে জানা যায় যে ১৮৬০ খ্রীস্টাব্দে উত্তর বিহারের দ্বারভাঙ্গা, হাতোয়া এবং বেতিয়া এই তিনটি গুরুত্বপূর্ণ জমিদারি 'কোর্ট অফ ওয়ার্ডসে'র অধীনে চলে যায়, ফলে জমির কর মারাত্মক রকম বেড়ে যায়। বর্ধিত করের চাপে এই সব জায়গার প্রচুর চাষী অন্য জায়গায় গিয়ে বসতি স্থাপন করে। এ ধরনের অনুমান অমূলক নয় যে, বেশ কিছু বিহারের কৃষিজীবী, কাছের জেলা মালদায় এসে বসতি স্থাপন করেছিল। মানিকচক, মথুরাপুর, ভাদো প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচুর হিন্দীভাষী লোক এখনও দেখা যায়, যাদের জীবিকা কৃষির উপর নির্ভরশীল। ১৮৬৬ খ্রীস্টাব্দে বিহারে যে ব্যাপক দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল, সেই দুর্ভিক্ষের উপর অজ্ঞাত-পরিচয় এক

লেখকের একটি পুস্তিকা পাওয়া গিয়েছে। সেই পুস্তিকায় আছে যে, বিহারের কৃষকেরা দুর্ভিক্ষের করালগ্রাস থেকে নিজেদের বাঁচানোর তাগিদে বিভিন্ন অঞ্চলে, এমন কি, তরাইয়ের দিকেও চলে যায়। সুতরাং এ-সমস্ত কৃষিজীবীদেরও মালদায় আসা কোনো বিচিত্র ব্যাপার ছিলনা। উপরোক্ত তিনটি তথ্য থেকে ধারণা করা যায় যে, মালদার বেশ কিছু অঞ্চলে কৃষির প্রচলন খুব পুরনো নয়। তবে এ ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করার মতো পর্যাপ্ত তথ্য আমাদের হাতে নেই। কোনো উৎসাহী গবেষক যদি মালদার চর ও দীয়ারা অঞ্চলের ভূমিরাজস্ব সংক্রান্ত পুরনো নথিপত্র নিয়ে নাড়াচাড়া করেন, তবে বেশ কিছু নতুন তথ্য মালদা জেলার ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করবে, সন্দেহ নেই।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের* প্রচলন হবার পর মালদার ভূমিবিন্যাস কি ধরনের ছিল, তা আমরা জানতে পারি Hunter সাহেবের Statistical Account of Bengal (1876) থেকে। গ্রামীণ অর্থনীতির সর্বোচ্চ শিখরে ছিল জমিদাররা। এরা বৃহৎ জমির মালিক হতো। জমি থেকে যে কর আসতো, তার থেকে নির্ধারিত রাজস্ব তারা সরাসরি সরকারকে দিয়ে দিত। এর পরের স্তরে ছিল মধ্যবর্তী কৃষিস্বত্বাধিকারী (Intermediate land holder)। এরা জমিদারের থেকে জমি ইজারা নিয়ে চাষীদের দিয়ে চাষ করাতো। জমিদার ও চাষীদের মধ্যে যোগসূত্র ছিল এই মধ্যবর্তী কৃষিস্বত্বাধিকারীরা। জমি ইজারা নিত বলে এদের ইজারাদারও বলা হতো। এদের ইজারা নেওয়া জমিগুলোকে মেয়াদি জমি বলা হতো। ইজারাদাররা জমি ইজারা নিয়ে আধি, ত্রিকুটি এবং ফরানী এই তিনটি ব্যবস্থার মাধ্যমে জমি চাষ করতো। আধি ব্যবস্থায় জমি ভাগচাষীদেব দেওয়া হতো। ভাগচাষীরা ফসল ফলাবার পর তা ইজারাদার ও ভাগচাষীর মধ্যে সমান দু'ভাগে ভাগ হয়ে যেত। ত্রিকুটি ব্যবস্থা-অনুযায়ী ফসল তিন ভাগ হতো। দু'ভাগ যেত ইজারাদারের কাছে, আর একভাগ থাকতো ভাগচাষীর। ফরানী বিঘা প্রতি একটি নির্ধারিত ফসলের অংশ ভাগচাষীকে ইজারাদারের হাতে তুলে দিতে হতো। এই ব্যবস্থায়, প্রাকৃতিক দুর্বিপাকে ফসল কম হলেও ভাগচাষী রেহাই পেত না। ইজারা-

* 'জেলার ইতিহাস' অংশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের উপর বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে।

দারকে তার প্রাপ্য ফসল দিতেই হতো। সুতরাং দেখা যাচ্ছে ব্যবস্থাটা ছিল এই রকম—ভাগচাষীরা ফসল ফলিয়ে, তার একটা অংশ দিত মধ্যবর্তী কৃষিস্বত্বাধিকারীদের। মধ্যবর্তী কৃষিস্বত্বাধিকারীরা সেই ফসল বিক্রি করে জমিদারকে কর দিত। জমিদার তার থেকে কর দিত ইংরেজ সরকারকে। সব থেকে দরিদ্র বর্গাদারের জমির পরিমাণ ছিল দুই বিঘা। আর জেলার সব থেকে ধনী জমিদারের জমির পরিমাণ ছিল এক হাজার বিঘা।

ইংরেজবাজার ও ওল্ড মালদায় বেশ কয়েক ঘর ক্ষেতমজুরের বসবাস ছিল। ধান কাটার সময় এদের ডাক পড়তো, জমির উপর এদের কোনো অধিকারই ছিল না। কাজ করানোর পর এদের দৈনিক মজুরি দেওয়া হতো দু আনা করে। হিন্দু ক্ষেতমজুররা তাদের স্ত্রীদের দিয়ে এবং মুসলমান ক্ষেতমজুররা তাদের শিশুদের দিয়েও অনেক সময় কাজ করাতো।

তৎকালীন মালদার কিছু অঞ্চলে, বিশেষত দিয়ারা অঞ্চলের কয়েকটি মহলে, হালহাসিলা ব্যবস্থায় জমি চাষ হতো। এই ব্যবস্থা-অনুযায়ী একটি গ্রামের সকলে একজোট হয়ে গ্রামের মোড়লের অধীনে জমি চাষ করতো। সকলে মিলে জমি চাষ করে ফসল ফলিয়ে, ফসলের নির্ধারিত অংশ সরাসরি সরকারকে দিত। এই ব্যবস্থা-অনুযায়ী তারা অনেক সময় হয়তো গ্রামের একটি অংশে চাষ আবাদ করতো না। ঐ জমি, গরু মোষ চড়ানোর কাজে ব্যবহার করতো। দুই বা তিন বছর এইভাবে জমিটাকে ফেলে রাখার পর তারা সেটায় চায় আবাদ করতো। তখন আবার অন্য জমি তারা ফেলে রাখতো এবং গরু মোষ চড়াতো। আবার বছর দুয়েক পরে তারা পুরোনো জমিতে চাষ করতে শুরু করতো আর ব্যাপারটা এরকম উল্টেপাল্টে চলতে থাকতো। কিন্তু এই ব্যবস্থা চালানোর জন্য দুটি জিনিসের প্রয়োজনীয়তা ছিল। এক, গ্রামবাসীর উপর গ্রামীণ গোষ্ঠীর (village community) কঠোর নিয়ন্ত্রণ এবং দুই, জমির প্রাচুর্য। এই দুটি ক্ষেত্রেই অসুবিধা দেখা দেওয়ার জন্য মালদা জেলায় হালহাসিলা ব্যবস্থার জনপ্রিয়তা ক্রমাগত কমে আসছিল।

এ ছাড়া মালদায় কতগুলি নিষ্কর কৃষিস্বত্বও ছিল। সরকার অথবা স্থানীয় জমিদার এই নিষ্কর কৃষিসত্ত্বগুলো তৈরি করেছিল। জানা যায় যে, মালদা জেলার উত্তর-পশ্চিম অংশে এক ফকির নবাব সিরাজউদ্‌দৌলার

কোন ক্ষতি সাধন করার জন্য নবাব মিরজাফরের কাছ থেকে নিষ্কর কৃষি-সত্ত্ব পেয়েছিলেন। বিভিন্ন ধরনের নিষ্কর কৃষিসত্ত্বগুলির মধ্যে ছিল দেবোত্তর (ঠাকুর দেবতার পূজার জন্য), ব্রহ্মোত্তর (ব্রাহ্মণদের ভরণপোষণের জন্য), বিষ্ণোত্তর (বিষ্ণুদেবের সেবার জন্য), গণকোত্তর (গণৎকারদের সাহায্যের জন্য), বৈদ্যোত্তর (কবিরাজদের জন্য), পীরান (পীরদের জন্য) এবং ফকিরান (ফকিরদের জন্য)। নিষ্কর কৃষিস্বত্বকে লাখিরাজ বলা হতো।

M. O. Carter-এর Final Report on the Survey and Settlement operations in the District of Malda (1928-35) দেখলে জানা যায় যে, বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধেও একই ধরনের কৃষিব্যবস্থা মালদা জেলায় প্রচলিত ছিল।

আধুনিক কৃষি ও কৃষিব্যবস্থা

মালদার জমি : মালদা জেলায় তিন ধরনের জমি রয়েছে। (১) বরিন্দ অঞ্চলের জমি, (২) টাল অঞ্চলের জমি এবং (৩) দিয়ারা অঞ্চলের জমি। মহানন্দা নদীর পূর্ব প্রান্তে বরিন্দ অঞ্চল অবস্থিত। বরিন্দ অঞ্চলের জমি উঁচু এবং তরঙ্গায়িত। মাঝে মধ্যে ছোট জলাশয় চোখে পড়ে। এই অঞ্চলের জমি লোহার মত শক্ত এবং পানীয় জলের যথেষ্ট অভাব এখানে রয়েছে। বরিন্দ অঞ্চল ধরে গ্রীষ্মকালে হাঁটলে চোখে পড়ে দিগন্তপ্রসারী ঢাল সংবলিত শূন্য শুষ্ক মাঠ। আবার শীতকালেই ফসলে ভরে ওঠে এই অঞ্চল। বরিন্দ অঞ্চলে আমন ধানের চাষ ভাল হয়। আমন ধানের বীজ পোঁতা হয় জুন-জুলাই মাসে, আর ধান কাটা হয় ডিসেম্বর মাসে। বামুন গোলা হবিবপুর প্রভৃতি এলাকা বরিন্দ অঞ্চলের অন্তর্গত।

মহানন্দা নদীর পশ্চিমাংশে রয়েছে টাল অঞ্চল। হরিশ্চন্দ্রপুর, খরবা এবং রতুয়ার কিছু অংশ টাল অঞ্চলের মধ্যে পড়ে। টাল অঞ্চলের জমি নিচু। তাই বন্যার শিকার হয় মাঝে মধ্যেই। খরবা থানায় মূলত ধান ও পাট চাষ হয়। রতুয়া থানায় ধান ও রবিশস্যের ফলন খারাপ নয়। সমগ্র টাল অঞ্চলেই প্রচুর আমবাগান রয়েছে। টাল অঞ্চলের জমি দু-ফসলী।

টাল অঞ্চল ক্রমাগত দক্ষিণে ও পশ্চিমে ঢালু হয়ে দিয়ারা অঞ্চলের

সঙ্গে মিশেছে। কালিন্দী নদীর দক্ষিণে এবং মহানন্দার পশ্চিমে এই দিয়ারা অঞ্চল। দিয়ারা মালদার সবথেকে জনবহুল এলাকা। এই অঞ্চলে প্রচুর আমবাগান ও তুঁতগাছ রয়েছে। এ ছাড়া গম, যব, আউশধান, আখ, সর্ষে প্রভৃতির ফলন এখানে ভালই। দিয়ারা অঞ্চলের অনেকটা অংশ জুড়ে এক সময় গঙ্গা প্রবাহিত হয়েছিল। এখন সে অঞ্চলগুলোতে চড়া পড়ে গেছে। দিয়ারার জমি নরম। বালির ভাগ কিঞ্চিৎ বেশি। ইংরেজবাজার, সুজাপুর, কালিয়াচক, মানিকচক ও রতুয়ার কিছু অংশ দিয়ারার মধ্যে পড়ে।

মালদার ফসল : ধান ফলনের দিক দিয়ে মালদা জেলা স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। পশ্চিম দিনাজপুর জেলা থেকে কিছু চাল আমদানি করতে হয়। তবে মালদায় বিভিন্ন ধরনের ধান চাষ হয়। নিচু ও জলা জমিতে বোরো ধানের চাষ হয়। বোরো ধানের বীজ বপন করা হয় শীতকালে। এপ্রিল-মে মাস নাগাদ ধান কাটা হয়। বোরোর চাষ এখন প্রায় জেলার সব জায়গাতেই হচ্ছে। ডাঙা বা উঁচু জমিতে অগভীর নলকূপের সাহায্যে এখন বোরো চাষ হয়। ভাদোই ধান বা আউশধানের গাছকে এক জায়গা থেকে উৎ-পাটিত করে অন্যত্র রোপণের কোন দরকার হয় না। বরিন্দ অঞ্চলে আমন ধানের চাষ হয়, এ কথা আগেই বলা হয়েছে। হৈমন্তিক ধানেরও চাষ হয় মালদায়। এই ধানের চারা এক জায়গা থেকে উৎপাটন করে বীজতলায় রোপণ করতে হয়। হৈমন্তিক ধানের বীজ পোঁতা হয় জুলাই মাসে। মাস খানেক পরে চারা চষা জমিতে রোপণ করতে হয়। ধান কাটা হয় জানু-য়ারি মাসে। উচ্চ ফলনশীল ধানও বর্তমানে মালদা জেলায় উৎপাদিত হচ্ছে। জেলার নানা ধরনের উচ্চ ফলনশীল ধানের মধ্যে বিখ্যাত জয়া, রত্না, পঙ্কজ, আই. আর. ৮ (I.R.8), আই. আর. ২০ (I.R.20) প্রভৃতি। আমন ধানেরও বিভিন্ন প্রকার ভেদ আছে—যেমন কালিরায়, রঘুশাল, ঝুলন, হাতিচাপা, সাহেবকলম, নাগরাই, ঝিঙাশাল প্রভৃতি। মালদা জেলায় আমন ধানের গড় ফলন বিঘা প্রতি ৭/৮ মন। আউশ ধানের গড় ফলন বিঘা প্রতি ৪/৫ মন। আর উচ্চ ফলনশীল চালের গড় ফলন ১৪/১৫ মন, প্রতি বিঘায়।

মালদার চর-ভূমিতে রবিশস্যের ফলন ভালই। মসুড়, কড়াইশুটি,

খেসাড়ি, তিসি প্রভৃতির বীজ পোঁতা হয় অক্টোবর মাসে, আর ফসল ঘরে তোলা হয় ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে। মুগ, কলাই, সর্ষে প্রভৃতির বীজ লাগানো হয় সেপ্টেম্বর মাস নাগাদ, আর ফসল পাওয়া যায় জানুয়ারি নাগাদ।

আঁশ জাতীয় জিনিসের মধ্যে মালদা জেলায় পাট ও শনের চাষ হয়। অল্পবিস্তর আখ ও পান-বরোজ মালদায় রয়েছে। পটল, ঝিঙা, বেগুন প্রভৃতির চাষ দিয়ারা অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে হয়।

রেশম কীটরা যে তুঁতপাতা খেয়ে বেঁচে থাকে, সেই তুঁতের চাষ মালদা জেলায় প্রচুর পরিমাণে হয়। Hunter-এর লেখা থেকে জানা যায় যে, উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে মালদায় প্রায় তিন-চতুর্থাংশ কৃষক তুঁতপাতা চাষের কাজে লিপ্ত থাকতো। তারা যে ধান ফলাত তাতে তাদের সারা বছরের খাওয়াটুকু হতো। তুঁতচাষের আয় থেকেই তারা কর দিত। যেমন-তেমন জমিতে তুঁত চাষ করা যায় না। উঁচু জমি তুঁত চাষের পক্ষে উপযুক্ত। কারণ, বন্যার জল তুঁতের জমিতে ঢুকলে তুঁত-চাষ মারাত্মক রকমের ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অনুর্বর জমিতে তুঁত চাষ করা সম্ভব নয়। তাই চাষীকে জমির উপর খুব বেশি যত্ন নিতে হয়। জমিকে সব সময় ঘিরে রাখতে হয়, আর নানা ধরনের সার দিয়ে জমির উর্বরতাকে অটুট রাখতে হয়। জমিতে তুঁতপাতা লাগালে, সেই গাছে পরবর্তী তিন চার বছর ধরে নতুন পাতা গজাবে। বছরে তিন থেকে চারবার তুঁতগাছ থেকে পাতা কেটে নিলে তুঁতগাছের বৃদ্ধি ত্বরান্বিত হয়।

মালদা জেলা আমের জন্য বিখ্যাত। ইংরেজবাজার, ওল্ড মালদা, রতুয়া, মানিকচক, কালিয়াচক খরবা ও হরিশ্চন্দ্রপুরে প্রচুর আমবাগান দেখতে পাওয়া যায়। মালদায় ফজলি আমের ফলন খুব বেশি। এছাড়া ল্যাংড়া, ক্ষিরসাপাতি, কিষাণভোগ, গোপালভোগ, বৃন্দাবনী, আশ্বিনা প্রভৃতি আমও মালদায় হয়। গোপালভোগ ও বৃন্দাবনী আম সব থেকে আগে বাজারে ওঠে। কিন্তু থাকে খুব কম সময়ের জন্য। ক্ষিরসাপাতি আমের সঙ্গে দক্ষিণ বাংলার হিমসাগরের বেশ মিল রয়েছে। মালদা জেলায় প্রায় ৫০,০০০ একর জমির উপর আমবাগান আছে। মালদায় আমের ফলন দুরকম ভাবে হয়। কোথাও অন্য-গাছের কলম কেটে, সেটা পুঁতে আম ফলানো হয়। কোথাও আবার আমের আঁটি পুঁতে গাছ করা হয়। ইদানীং নানা ধরনের কৃত্রিম প্রক্রিয়ায় (কার্বাইড ইত্যাদির সাহায্যে)

খুব তাড়াতাড়ি আম পাকানো হচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের ধারণা, এর ফলে আমের স্বাদ নষ্ট হচ্ছে। এখন আমের ফলন কমে গেছে। বহু বছর পরে ১৯৮৩ খ্রীস্টাব্দে আমের ফলন ভাল হয়েছিল। অনেকের ধারণা মালদা জেলায় প্রচুর ইট-ভাঁটা তৈরি হওয়ায়, ইট-ভাঁটার ধোঁয়া আম ফলনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে।

সমগ্র মালদা জেলায় ৯ লক্ষ ৭৬ হাজার একর জমিতে চাষের কাজ হয়। শতকরা ৫৩ ভাগ জমিতে ধান চাষ হয়। সমস্ত চাষের জমির শতকরা ৩৯ ভাগ জমিতে একাধিক বার চাষ করা হয়ে থাকে।

সেচ-ব্যবস্থা : মালদা জেলায় মোট ১ লক্ষ ৭১ হাজার একর জমিতে সেচের ব্যবস্থা করা হয়েছে। অর্থাৎ সমগ্র কৃষিজমির মাত্র ১৮ শতাংশ জমি এই জেলায় সেচের সুবিধা পেয়েছে। বরিন্দ অঞ্চলে সেচের ব্যবস্থা পুকুরভিত্তিক। খরা ইত্যাদির ফলে পুকুর শুকনো থাকলে এই অঞ্চলে সেচের বিশেষ অসুবিধা হয়। তাই ইদানীং পাম্পসেটের সাহায্যে নদী থেকে জল তুলে বরিন্দ এলাকায় সেচের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। টাল অঞ্চলে সেচের প্রধান উপায় অগভীর নলকূপ। দিয়ারা অঞ্চলে প্রচুর বিল আছে। বিলের পার্শ্ববর্তী জমিগুলোতে জাঁতের ব্যবস্থায় সেচকার্য চালানো হয়। একমাত্র ওল্ড মালদা ছাড়া অন্য কোনো থানাতেই গভীর নলকূপের সাহায্যে সেচের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়নি। ১৯৭৯-৮০ খ্রীস্টাব্দের একটি হিসাব থেকে দেখা যাচ্ছে যে, এই দুই বছরের জন্য মালদা জেলার সেচ বাবদ সরকারি বরাদ্দ ছিল ৯৫ লক্ষ টাকা। ১৯৭৮ খ্রীস্টাব্দে নদীর জল তোলার পাম্প সেট কেনার জন্য মালদা জেলা বিশ্ব ব্যাংক থেকে ধার নিয়েছিল ২০ লক্ষ টাকা।

চাষের সরঞ্জাম : মালদা জেলায় এখনও সাবেককালের সরঞ্জামই মূলত ব্যবহৃত হচ্ছে। ইদানীং কিছু কিছু জায়গায় এক বিশেষ ধরনের লাঙল (Mould Board Plough), সারি দিয়ে বীজ বসানোর এক ধরনের যন্ত্র (Seed-Drill), চাকা যুক্ত নিড়ানী (Wheel Hoe) ইত্যাদির ব্যবহার দেখা যাচ্ছে। উচ্চ ফলনশীল বীজ (High Yielding Variety), সার, পিটার পাম্প, কীটনাশক কেমিক্যালস প্রভৃতির

সাহায্যও মালদার কৃষকরা নিচ্ছে। কিন্তু উপরোক্ত অধিকাংশ জিনিসই বিদেশি সহযোগিতায় (কখনও পুঁজির মাধ্যমে, কখনও প্রযুক্তি বিদ্যার মাধ্যমে) তৈরি। তাই এই সরঞ্জামগুলো কিনতে হয় চড়া দামে। ধনী চাষী বা জোতদার ছাড়া কারো পক্ষেই এত দাম দিয়ে এগুলো কেনা সম্ভব নয়। তাই নতুন-আসা কৃষি-সরঞ্জাম মালদার প্রান্তিক চাষীদের কোনোই সুবিধা করতে পারেনি। অধুনা মালদায় কয়েক ঘর ধনী চাষী ট্রাক্টরের সাহায্যেও চাষ আবাদ করছে।

মালদা জেলার গ্রামীণ অর্থনীতিতে শ্রেণীবিন্যাস : মালদা জেলায় জমিদার এখন নেই বললেই চলে। ১৯৫৩ খ্রীস্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গ সরকার যখন জমিদারি-উচ্ছেদ আইন প্রণয়ন করল, তখনই অনেক জমিদার রাতারাতি পোশাক পাল্টে জোত্‌দার কিংবা ধনী চাষী হয়ে গেল। এখন মালদা জেলায় ধনী চাষীর সংখ্যা প্রচুর। ধনী চাষীর পরের স্তরে রয়েছে মধ্য চাষী। তার নিচে প্রান্তিক চাষী। মালদা জেলায় ৫০ বিঘা বা তার উপর জমি থাকলে তাকেই ধনী কৃষক বলা যেতে পারে। ১০ বিঘা থেকে ৪৫/৫০ বিঘা জমির মালিক মধ্য চাষীর পর্যায়ে পড়ে। ১০ বিঘারও কম জমির মালিক প্রান্তিক চাষী।

মালদা জেলায় বেশ কয়েক ঘর জোতদার রয়েছে, যাদের জমির পরিমাণ ৪০০/৫০০ বিঘা। এই সমস্ত জোতদাররা এবং ধনী কৃষকরা জমি বর্গা দিয়ে দেয় এবং বর্গাদারদের দিয়ে চাষ করায়। কিছু জমিতে আবার তারা ক্ষেতমজুরের সাহায্যেও চাষ করে। ধনী চাষীরা এবং জোতদাররা জমি তৈরি, রোয়া, নিড়াই, ঝাড়াই মাড়াই, ধান কাটা, খামার জাত করা প্রভৃতি কাজ সবসময় ক্ষেত-মজুরদের দিয়ে করায়। মাঝারি চাষীরা সাধারণত নিজেরাই কাজ করে, দরকারে দু'একটি ক্ষেত-মজুর রাখে। প্রান্তিক চাষীরা কৃষি-সংক্রান্ত সব কাজ নিজেরাই করে।

মালদার টাল ও দিয়ারা অঞ্চলে ধনী চাষীদের যথেষ্ট প্রতিপত্তি রয়েছে। ধনী চাষীরা জেলার কোনো কোনো জায়গায় এখনও গরীব লোকদের দিয়ে বেগার খাটায়। টাল ও দিয়ারার অনেক ধনী চাষী বরিন্দ অঞ্চলে প্রচুর জমি কিনে রেখেছিল। এই অঞ্চলের অধিকাংশ জমিই তারা চাষ করত বর্গাদারদের দিয়ে। চাষের যাবতীয় খরচ

বর্গাদারদের দিতে হতো। ফসল ফলানোর পর, সেই ফসল জোতদার এবং বর্গাদারদের মধ্যে আধাআধি ভাগ হতো। ১৯৬৭ খ্রীস্টাব্দে দার্জিলিং জেলার নকশালবাড়িতে যে কৃষক-আন্দোলন হয়েছিল, তার প্রভাব মালদা জেলাকেও স্পর্শ করেছিল। মালদার ভাগচাষীরা (বর্গাদার) ফসলের তিন ভাগের দু ভাগ নিজেদের ঘরে তোলার দাবি জানিয়েছিল। সেই সময় ধনী চাষীরা সামান্য অসুবিধায় পড়ে। তারা তখন থেকেই কিছু কিছু ভাগচাষী উচ্ছেদ করতে শুরু করে এবং কামাতবাড়ি প্রথায় ক্ষেতমজুরদের দিয়ে চাষ করাতে থাকে। কামাত কথার অর্থ সাময়িক। অর্থাৎ প্রয়োজনের সময় ধনী কৃষকরা ক্ষেতমজুর নিয়োগ করে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার অপারেশন বর্গা চালু করার পর জমির ওপর বর্গাদারদের কিছুটা অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু বাস্তবে বর্গাদারদের অবস্থার বিশেষ উন্নতি হয়নি। কারণ প্রথমত, বর্গাদার আইনের মাধ্যমে বর্গাদার বা জমির মালিকানা পায়নি, পেয়েছে কৃষিস্বত্ব। দ্বিতীয়ত কৃষিস্বত্ব পাওয়ার পরও জমির পিছনে যে খরচ করতে হয়, তা চালানোর ক্ষমতা অধিকাংশ বর্গাদারেরই নেই। সুতরাং বর্গাদারদের নির্ভর করতে হয় ঋণের উপর। সরকার ঋণের ব্যবস্থা করেছে। কিন্তু অল্প কয়েক ঘর বর্গাদার ছাড়া এই স্বল্প সুদে ঋণের সাহায্য কেউই পায়নি। (পঞ্চায়েত-গুলোর অব্যবস্থাই এর কারণ।) এমতাবস্থায়, অধিকাংশ বর্গাদাররা আবার ধনীচাষীদের কাছে হাত পাততে বাধ্য হয়। মালদা জেলায় দেখা গেছে, প্রান্তিক চাষীদের মত বর্গাদাররাও ধনী কৃষকের থেকে বীজ ধার নেয়। ফসল ফলানোর পর গৃহীত বীজের দ্বিগুণ ফসল ধনী চাষীকে দিয়ে, তারা ঋণ পরিশোধ করে। সুতরাং বর্গাদারের কাছে সামান্য ফসলই অবশিষ্ট থাকে। এরকম ঘটনাও মালদায় ঘটছে যে, কৃষির খরচের চাপ, ধনী চাষী বা জোতদারের থেকে নেওয়া ঋণের সুদের চাপ, কয়েক ঘর বর্গাদারকে কৃষিস্বত্ব ত্যাগ করে জোতদারের ক্ষেতমজুরে পরিণত হতে বাধ্য করেছে। তাছাড়া, এখনও অনেক ধনী চাষীর বেশ কিছু পরিমাণ জমি বর্গা হয়নি। এসব জমিতে ভাগচাষীরা আগের পদ্ধতিতেই (ফসল আধাআধি ভাগ ও চাষের খরচ ভাগচাষীর) জমি চাষ করছে। এমন অনেক প্রন্তিক চাষী আছে, যাদের জমির পরিমাণ ২/৩ বিঘা, তারা ধনী চাষীর জমিতে ভাগচাষী হিসাবেও কাজ করে। মালদায় দিয়ারা অঞ্চলের

অনেক প্রান্তিক ও মধ্য চাষী এবং ভাগচাষী রেশম চাষে নিযুক্ত থাকে।

মালদা জেলার গ্রামীণ অর্থনীতির সর্বনিম্ন ধাপে ক্ষেতমজুর শ্রেণীর অবস্থান। যদিও ক্ষেতমজুরদের ন্যায্য মজুরি পাওয়ার দাবি বহুদিনের এবং ন্যূনতম একটা মজুরির পরিমাণ সরকার-কর্তৃক নির্ধারিত হয়েছে, তা সত্ত্বেও ক্ষেতমজুররা এখনও ন্যায্য মজুরি থেকে বঞ্চিত হয়। উপরন্তু, সারা বছর এদের সবার কাজ থাকে না। দরকারের সময় ধনী চাষীরা এবং কখনও মধ্যচাষীরা এদের ব্যবহার করে। যখন এদের কাজ থাকে না, তখন এদের মধ্যে কেউ ইট-ভাঁটার শ্রমিকের কাজ করে, কেউ বা কোনো ঠিকদারের অধীনে কোনো বিশেষ প্রকল্পে কাজ করে, আবার কেউ বা আড়কাঠির সঙ্গ নিয়ে সুদূর বর্ধমান জেলায় যায় মাটি কাটতে।

সুতরাং মালদা জেলার ভূমিস্বত্বের চেহারাটা ভাল করে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, গ্রামীণ অর্থনীতির সর্বোচ্চ ধাপে রয়েছে ধনী চাষী বা জোতদার। প্রান্তিক চাষী থেকে শুরু করে ভাগচাষী এবং ক্ষেতমজুর সকলের টিকি বাঁধা থাকে ধনী চাষীর কাছে। এর পরের স্তরে রয়েছে মাঝারি চাষী। তার পরে একে একে রয়েছে প্রান্তিক চাষী, ভাগচাষী এবং ক্ষেতমজুর। সুতরাং মালদার গ্রামীণ অর্থনীতিতে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার অবক্ষয় এখনও চোখে পড়ে। Malda Small Farmers Development Agency নামে একটি সরকারি সংস্থার হিসাব থেকে দেখা যায় যে, মালদা জেলায় ৪১,৩০৬টি মধ্যচাষী, ৮৪,২২৩টি প্রান্তিক চাষী এবং ৫৭,২১৪টি ক্ষেতমজুর পরিবার আছে।

শস্যবিক্রয়-পদ্ধতি : প্রান্তিক চাষীরা ঘরে শস্য তোলার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় চাষের ঋণ পরিশোধ করার জন্য ফড়েদের কাছে তা বিক্রি করে দেয়। কৃষক ও বাজারের মধ্যস্থ ব্যক্তি (middle man)-দেরই ফড়ে বলা হয়। এই ফড়েরা আবার হাটে এই শস্য বিক্রি করে। ধনী চাষীরা শস্যের দাম না চড়া পর্যন্ত, শস্য গোলায় মজুত রাখে ; দাম বাড়লে শস্য বাজারে ছাড়ে। ধনী চাষীরা প্রায়ই প্রাকৃতিক দুর্বিপাকের সুযোগ নেয়, এবং অভাবের সময় অন্যায্য দামে তাদের মজুতকৃত ফসল বিক্রি করে। অনেক সময় ব্যবসায়ীরাও ধান মজুত করে রাখে এবং সুযোগ এলে তার সদ্ব্যবহার করে ধান চড়া দামে বিক্রি করে। সরকার শস্যমূল্যের কোনো

নিয়ন্ত্রণ করেনি। তাই ধনী চাষী ও ব্যবসায়ী ইচ্ছেমত শস্যের দাম বাড়াতে পারে।

আমের বাজারে আসার পদ্ধতি কিছুটা অন্য ধরনের। আমবাগানের মালিক সাধারণত আমবাগান ফড়েদের ইজারা দিয়ে দেয়। যে ক'দিনের মেয়াদে ফড়ে বাগান ইজারা নেয়, সে ক'দিনের জন্য বাগান সংক্রান্ত যাবতীয় খরচ ফড়েকেই বহন করতে হয়। ফল হবার পর ফড়ে সেই ফল হাটে বা বিভিন্ন বাজারে বিক্রি করে। যে বছর আম ভাল হয় না, ফড়েদের বিশেষ লাভ হয় না। আর যে বছর আম ভাল হয় সে বছর ফড়েরা খুব লাভ করে। কিন্তু এই বাড়তি লাভে, আমবাগানের মালিকের কোনো অধিকার নেই। বাগান ইজারা দেবার সময় সে যে-টাকাটা পেয়েছে, তা নিয়েই তাকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়।

মালদা জেলায় ফুড কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়া এবং রাজ্য সরকার নিয়ন্ত্রিত অনেকগুলি পণ্যাগার (ware house) আছে। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আমদানিকৃত পণ্য রাখা হয় এই পণ্যাগারগুলিতে। সেখান থেকে পণ্য বিভিন্ন অঞ্চলের হাটে যায়। মালদা বাজার কমিটির উদ্যোগে সামসীতে একটি রেগুলেটেড মার্কেট তৈরি হয়েছে। এই কমিটি ইংরেজ-বাজারে একটি হিমঘর (cold storage) তৈরির পরিকল্পনা করেছে।

কৃষি-ঋণ : দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মতো মালদা জেলাতেও সরকার বিভিন্ন ব্যাংক এবং সমবায়-সংস্থার মাধ্যমে কৃষি-ঋণ দেবার ব্যবস্থা করেছে। মালদা জেলার কৃষি-অর্থনীতির চেহারা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আমরা দেখেছি যে, কেবল মাত্র ধনী কৃষক ছাড়া কারও পক্ষেই সরকারি ঋণ গ্রহণ করা সম্ভব নয়। কিছু মাঝারি চাষীও অবশ্য ঋণের সুবিধা পেয়েছে। অল্প কিছু প্রভাবশালী বর্গাদার, যাদের পঞ্চায়েতের সঙ্গে যোগাযোগ ভাল, তারাও সরকারি ঋণের দ্বারা উপকৃত হয়েছে। কিন্তু প্রান্তিক চাষী এবং অধিকাংশ বর্গাদার অর্থনীতির এমন একটা স্তরে রয়েছে যে, তাদের প্রায়ই ধনী চাষীর কাছে ঋণগ্রস্ত থাকতে হয়। তারা আবার সরকারের থেকে ঋণ নিয়ে ঋণের বোঝা বাড়াতে চায় না, তা'ছাড়া এমন অনেক প্রান্তিক চাষী ও বর্গাদার আছে, যারা সরকারি ঋণের নিয়মকানুন জানা দূরের কথা, সরকার যে ঋণ দেয় এ-ব্যাপারেও তারা

ওয়াকিবহাল নয়। এমন কি, এ ব্যাপারে খোঁজ নিতে জেলা-শহরে আসার আর্থিক সঙ্গতিও এদের অধিকাংশেরই নেই।

মালদা জেলায় বিভিন্ন ব্যাংকের মাধ্যমে সরকার ১৯৮১ খ্রীস্ট্রাব্দে কৃষি-ঋণ দিয়েছে ১৬১.৮৮ লক্ষ টাকা। ১৯৮২ খ্রীস্টাব্দে কৃষি-ঋণের পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছিল ২৪৬.২৫ লক্ষ টাকা। ১৯৮১ খ্রীস্টাব্দে ক্ষুদ্র সেচ-প্রকল্পে সরকারি ঋণের পরিমাণ ছিল ১৪৩.৬৮ লক্ষ টাকা। ১৯৮২তে উক্ত প্রকল্পে সরকারি ঋণ কমে গিয়ে হয়েছিল ৩৬.৩৮ লক্ষ টাকা। চাষের সরঞ্জাম কেনার জন্য ১৯৮১ খ্রীস্টাব্দে সরকার ৪৪.৩৫ লক্ষ টাকা ঋণ দিয়েছিল। ১৯৮২ সালে এই বাবদ সরকারি ঋণের পরিমাণ ছিল ৪০.৬৭ লক্ষ টাকা। ১৯৮১ খ্রীস্টাব্দের আগে আমবাগানে বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ বর্ষণ করার পিচকারি কেনার জন্য প্রতি বাগান মালিককে ১৮৭ টাকা দেওয়া হতো। ১৯৮১-র পর তা বাড়িয়ে ৫০০ টাকা করা হয়েছে। এছাড়া মালদা জেলার প্রায় সর্বত্রই (কেবল হরিশ্চন্দ্রপুর-১ ও রতুয়া-২ ব্লক ছাড়া) সস্তায় সার বিক্রি-কেন্দ্র সরকারি উদ্যোগে তৈরি হয়েছে।

যে-সমস্ত ব্যাংক কৃষি-ঋণ দেবার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে তাদের মধ্যে আছে, ইউনাইডেট ব্যাংক অফ ইণ্ডিয়া, এলাহাবাদ ব্যাংক, ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক, গৌড় গ্রামীণ ব্যাংক, ডিস্ট্রিক্ট ক্রেডিট কো-অপারেটিভ ব্যাংক প্রভৃতি।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, সরকারি ঋণের পরিমাণ মালদার কৃষিক্ষেত্রে কম নয়। কিন্তু এই ঋণের দ্বারা আশীর্বাদপুষ্ট হচ্ছে মূলত ধনী চাষী। তারা সরকারি ঋণ নিয়ে উচ্চফলনশীল বীজ, রাসায়নিক সার, পাম্পসেট ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি কেনে। সুতরাং অত্যধিক মূল্য দিয়ে ধনী চাষী-দের এই সরঞ্জামগুলো কিনতে হয়। বিদেশি কোম্পানিগুলি ইচ্ছেমতো দাম বাড়িয়ে যায়। ১৯৭৩ সালেই রাসায়নিক সারের দাম দু'গুণ বেড়ে গেছে। পরের বছর এর দাম আরও তিনগুণ বেড়েছে। সুতরাং বিদেশি কোম্পানির এক-এক খোঁচায় ধনী কৃষকের নাভিশ্বাস ওঠে। মালদা জেলাতেই দেখা গেছে ধনী কৃষক উন্নত মানের বীজ ও সার না কিনতে পেরে পুরোনো ধাঁচের কৃষিতে ফিরে গেছে। সুতরাং এত টাকার সরকারি ঋণ যা প্রধানত ধনী চাষী পাচ্ছে, তা দিয়ে তারা বিদেশি সরঞ্জাম কিনছে চড়া দামে।

৬

শিল্প

মালদা জেলায় শিল্পের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র থেকে আমরা জানতে পারি যে পৌণ্ড্রবর্ধনে এক ধরনের সূক্ষ্ম এবং অত্যন্ত সূক্ষ্ম মূল্যবান রেশমি কাপড় তৈরি হতো। সুতরাং অর্থশাস্ত্রে পৌণ্ড্রবর্ধন বা গৌড়ের রেশম-শিল্পের উল্লেখ প্রমাণ করে যে মৌর্য যুগ অথবা তার আগে থেকেই এই অঞ্চলের রেশম-শিল্প সুবিখ্যাত। কেবল প্রাচীন যুগেই নয়, মধ্য যুগেও যে মালদার রেশমশিল্প যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ছিল তার প্রমাণ মেলে আইন-ই আকবরী থেকে। আইন-ই আকবরীতে 'গঙ্গাজল' নামে এক অতি মূল্যবান রেশমি কাপড়ের উল্লেখ আছে, যা তৈবি হতো কেবল গৌড়ে। তপন রায়-চৌধুরীর Bengal under Akbar and Jahangir নামে বইতেও একটি মজার ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। শায়েস্তা খাঁ যখন বাংলাব সুবাদার ছিলেন, তখন মির্জানাথন নামে মোঘল সম্রাটের এক উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মচারী ৪,০০০ টাকা দিয়ে মালদায় এক টুকরো রেশমি কাপড় কিনে-ছিলেন। পরবর্তীকালে Hedge সাহেবের ডাইরি থেকে মালদার রেশম-শিল্প সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। সপ্তদশ শতকের শেষের দিকে মালদায় চন্দেনিয়ার, সুজি, ইলাচ, নেহালবারি, মলমল, তঞ্জীব প্রভৃতি নানা ধরনের রেশমি কাপড় তৈরি হতো। ১৭৮০ খ্রীস্টাব্দে, যখন Charles Grant মালদার Commercial Resident হিসেবে কাজ করেছিলেন, তখনও মালদার রেশম ও বস্ত্রশিল্প বাংলার অর্থনীতিতে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে ছিল। সেই সময় মালদার রেশম ও বস্ত্র-শিল্পের পিছনে বছরে প্রায় ৫০,০০০ পাউণ্ড বিনিয়োগ করা হতো।

শুধু ভারতবর্ষ নয়, ইউরোপের বিভিন্ন বাজারেও মালদাই রেশমের যথেষ্ট কদর ছিল।

অষ্টাদশ শতকে যখন বিভিন্ন ইউরোপীয় দেশের ভারতবর্ষকে উপনিবেশ করার হিড়িক পড়ে গিয়েছিল, তখনই ইংরেজ, ডাচ, ফরাসি প্রত্যেকটি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির নজর পড়েছিল মালদার রেশমের দিকে। ভারতের বাইরে বিভিন্ন দেশের বাজারে মালদাই রেশমের চাহিদার কথা বুঝতে পেরেছিল ঔপনিবেশিক শক্তিগুলো। বুঝতে পেরেই রেশম কারখানা খুলতে লাগল ইংরেজ, ফরাসি ও ডাচেরা। অবশ্য Hunter সাহেবের লেখা থেকে জানা যায় যে, এমনকি ষোড়শ শতকেও মালদাই রেশম রাশিয়াতে রপ্তানি হতো। ষোড়শ শতকের শেষ দিকে সেখ ভিক্ নামে জনৈক ব্যবসায়ী তিনটে জাহাজ বোঝাই মালদার রেশমি কাপড় নিয়ে রাশিয়ার দিকে যাত্রা করেছিলেন। পথে পারস্যের কাছাকাছি কোনো জায়গায় তার দুটি জাহাজ লুণ্ঠিত হয়। Hunter-এর বিবরণ থেকে আমরা মালদার রেশম-শিল্প সম্পর্কে আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাই। ইংরেজরা প্রথম রেশমের কারখানা তৈরি করে মালদার ইংরেজ-বাজার অঞ্চলে ১৬৮৬ খ্রীস্টাব্দে। তবে মালদায় তুঁত-পোকার চাষ বাড়ানোর ব্যাপারে সর্বপ্রথম গুরুত্ব দেন জনৈক ফরাসি ভদ্রলোক। যদিও এখনও পর্যন্ত এই ফরাসির নাম জানা যায়নি, তবুও একটা বিষয়ে আমরা মোটামুটি নিশ্চিত যে মালদায় ফরাসিরা রেশমের যে কারখানা তৈরি করেছিল এই ভদ্রলোকই সে ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। ১৭৬০ খ্রীস্টাব্দের কাছাকাছি কোন সময়ে এই কারখানা তৈরি হয়েছিল। তবে রেশম তৈরির প্রথম গুরুত্বপূর্ণ কারখানা (silk gilature) প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সিংহাবাদে, ১৭৭০ খ্রীস্টাব্দে, প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন Adney নামে জনৈক ইংরেজ, দুটি ভিন্ন পর্যায়ে মালদার রেশম শিল্প গড়ে উঠেছিল। একটা পর্যায়ে গুটিপোকা থেকে কাঁচা রেশম তৈরি করা হতো। আর দ্বিতীয় পর্যায়ে এই কাঁচা রেশম থেকে নানা ধরনের বস্ত্র তৈরি করা হতো। মালদাই রেশমের কাপড়গুলো নানা ধরনের এবং বিভিন্ন রং এর হতো। কাপড় তৈরির আগেই রেশমী সুতাগুলোকে রং করা হতো। রঙীন সুতাগুলো দিয়েই রঙীন কাপড় তৈরি হতো। মালদার রেশম শিল্প, সুতো থেকে কাপড় তৈরির পর্যায়ে মূলত দেশি পুঁজির ওপরই নির্ভরশীল ছিল। ঘরে ঘরে তাঁত ছিল। তাঁতিরা ঘরে বসেই রেশমজাত বস্ত্র তৈরি করতো। ১৮১০ খ্রীস্টাব্দে Buchanan Hamil-

ton সাহেব মালদায় ৪,০০০ তাঁত দেখেছিলেন। যাইহোক, এই তাঁত থেকে তৈরি করা রেশমি কাপড় বাজারে আসতো। মহাজনরা সেগুলো কিনে নিত। তারপর তারা এগুলি বারাণসী এবং কোলকাতায় বিক্রি করতো। তাঁতিরা প্রয়োজনে মহাজনদের কাছ থেকে চড়া সুদে ধার নিত।

কিন্তু গুটিপোকা থেকে কাঁচা রেশম (raw silk) তৈরির ব্যাপারে দেশি ও বিদেশি দুধরনের পুঁজিই খাটতো। কতগুলো কারখানা গড়ে উঠেছিল দেশি মুৎসুদ্দি এবং ইউরোপীয়দের যৌথ পুঁজি এবং উদ্যোগের ভিত্তিতে। আর কতগুলো কারখানা ছিল সম্পূর্ণ ইউরোপীয় মালিকানারই অধীনে। উনবিংশ শতকের শেষ দিকে মালদা অঞ্চলে অন্তত সাতটি ইউরোপীয় কোম্পানি গুটিপোকা থেকে কাঁচা রেশম বার করতো। এগুলোর মধ্যে ব্রিটিশ Watson and Co. এবং ফরাসি M. M. Louis Poyen and Cie কোম্পানি ছিল বিখ্যাত। Louis Poyen কোম্পানির অন্যতম ম্যানেজার S. J. Andrews সর্বপ্রথম মালদা জেলায় কাঁচা রেশম তৈরির কারখানায় বাষ্পীয় ইঞ্জিনের ব্যবহার শুরু করেছিলেন। এই সমস্ত কারখানায় তৈরি কাঁচা রেশম ইউরোপের বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করা হতো।

রেশম শিল্প ছাড়াও, Hunter সাহেবের লেখা থেকে জানা যায় যে, উনবিংশ শতকের শেষ দিকে মালদা জেলায় বেশ কিছু নীল (Indigo) তৈরির কারখানা ছিল। ১৮৭৩ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ মালদায় অন্তত কুড়িটি নীল তৈরির কারখানা ছিল। এগুলো অধিকাংশই গড়ে উঠেছিল ইউরোপীয় পুঁজি এবং উদ্যোগের উপর নির্ভর করে।

Report on the Survey and Cottage Industies in Bengal (1929) থেকে জানা যায় যে পিতল ও কাঁসা-শিল্পও এক সময়ে মালদার অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছিল। গোটা মালদা জেলায় প্রায় সাড়ে ছশো লোক কাঁসার কাজে লিপ্ত ছিল। ইংলিশবাজার থানায় প্রায় জনা কুড়ি এবং খরবা থানার অন্তর্গত কলিগ্রাম অঞ্চলে প্রায় ত্রিশ জন কাঁসা শিল্পী ছিল। তবে নবাবগঞ্জ থানায় কাঁসাশিল্পীর সংখ্যা ছিল খুব বেশি। নবাবগঞ্জ এখন বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত।

মালদা জেলার কাঁসা শিল্পের গড়ে ওঠার ব্যাপারে একটা মজার গল্প প্রচলিত আছে। বর্তমান কারিগরদের পূর্বপুরুষদের একদল প্রচণ্ড বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচার তাগিদে একবার একটি মন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। সেখানে তারা এক দৈববাণী শুনতে পায় – 'সাতে দুই এ কর জড়ো তায় আনো, তায় গড়ো,' অর্থাৎ সাত ভাগ তামা এবং দুই ভাগ রাং মিশ্রিত করে কাঁসা শিল্প তৈরি করতে হবে। হয়ত এ প্রবাদের মধ্যে আদৌ কোন সত্য নেই, তবুও এ প্রবাদকে বিশ্বাস করেই গড়ে উঠেছে মালদা জেলার কাঁসা-শিল্প।

M. O. Carter-এর Final Report on Survey and Settlement operation in the Distict of Malda (1929) থেকে জানা যায় যে, একসময় লাক্ষা-শিল্পের জন্যও মালদা জেলা বিখ্যাত ছিল। রতুয়া থেকে আরম্ভ করে দক্ষিণ মালদার কালিয়াচক পর্যন্ত সুবিস্তৃত অঞ্চল ধরে মালদা জেলায় লাক্ষা চাষ হতো। লাক্ষা থেকে রং তৈরি করার শিল্প মালদা জেলায় গড়ে উঠেছিল। কিন্তু বর্তমানে এই শিল্প আর নেই। লাক্ষা চাষও বন্ধ হয়ে গেছে। আধুনিককালে কৃত্রিম প্রক্রিয়ায় তৈরি রঙের প্রাচুর্যই খুব সম্ভবত লাক্ষাশিল্পের উঠে যাওয়ার মূল কারণ।

এছাড়া মালদা জেলায় কারিগরেরা বাঁশ দিয়ে সুন্দর সুন্দর ডালা, কুলা, মোড়া ইত্যাদি তৈরি করতো।

জেলার বর্তমান শিল্প: আধুনিককালে বৃহদায়তন শিল্প বলে যা বোঝায়, তা মালদা জেলায় আদৌ গড়ে ওঠেনি। তা সত্ত্বেও জেলার শহরাঞ্চলে বেশ কিছু চালের মিল, রেশম কারখানা, বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র এবং কিছু কাঠের কারখানা দেখা যায়। এই সবগুলোই সরকারের ফ্যাকটরি আইন (Factories Act) অনুযায়ী অনুমোদিত। তবে এর কোনটিই বৃহদায়তন শিল্পের পর্যায়ে পড়ে না। তবে ফরাক্কার কাছে একটি বৃহৎ বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্র গড়ে উঠছে। এই বিদ্যুৎ-কেন্দ্র তৈরির কাজ সমাপ্তপ্রায়। *এই বিদ্যুৎ-কেন্দ্র তৈরি হয়ে গেলে, শিল্পে পিছিয়ে-থাকা মালদা জেলা* শিল্পে অগ্রগতির ক্ষেত্রে একটা লম্বা লাফ দেবে সন্দেহ নেই।

তা যাই হোক, এখনও মালদা জেলার শিল্প বলতে ক্ষুদ্রায়তন ও কুটির শিল্পকেই বোঝায়, এই ক্ষুদ্রায়তন ও কুটির শিল্পের মধ্যে রয়েছে

তাঁত, কাঁসাশিল্প, আম থেকে বিভিন্ন ধরনের খাদ্য প্রস্তুত করার শিল্প, বিড়ি তৈরি, মৃৎশিল্প কাজ, ইট ভাটা প্রভৃতি।

মালদা জেলায় কুটির শিল্পগুলির মধ্যে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ হলো তাঁতে তৈরি বস্ত্রশিল্প। মালদা জেলায় প্রায় ১০,০০০ তাঁত রয়েছে এবং প্রায় ২০,০০০ লোক এই তাঁতের মাধ্যমেই নিজেদের অন্ন সংস্থানের চেষ্টা করছে। কালিয়াচক, মানিকচক, ইংলিশবাজার এই তিনটি থানাতেই তাঁতে তৈরি বস্ত্রশিল্পের প্রাচুর্য দেখা যায়। শাড়ি, গামছা প্রভৃতিই এই শিল্পের মুখ্য উৎপাদিত দ্রব্য।

যে কাঁসাশিল্প একদিন মালদার অর্থনীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছিল, সেই কাঁসাশিল্প এখন প্রায় ধ্বংসের মুখে। কাঁসার বাসন তৈরি করাব পাঁচটি প্রক্রিয়া আছে। অর্থাৎ পাঁচটি ভাগে শ্রমিকদের ভাগ করা হয়। গড়নদার লাগে একজন, পিটনদার ছয় জন, মাঠনদার একজন, চাঁছনদার একজন এবং কুঁদনদার লাগে দুইজন। গড়নদারের কাজ কাঁসা গলানো ও ছাচে ঢালা। পিটনদারের কাজ হাতুড়ি দিয়ে পেটা। চাঁছনদার থালা চেঁছে সোনালি রং বার করে। কুঁদনদার পালিশ করে এবং মাঠনদার পুরোপুরি আকৃতি দেয়। অর্থাৎ এদের সম্মিলিত প্রয়াসেই কাঁসার বাসন তৈরি হয়। কিন্তু শ্রমিকদের মজুরির তফাত আছে। পিটনদাবের মজুরি দৈনিক সাত টাকা, মাঠনদারের থালা প্রতি দশ পয়সা, চাঁছনদারের থালা প্রতি নব্বুই পয়সা এবং কুঁদনদারের দৈনিক মজুরি নটাকা। প্রতিদিন জ্বালানি লাগে প্রায় চল্লিশ টাকার মত। সবসময় কাঠকয়লা জেলা থেকে পাওয়া সম্ভব হয় না। তখন কাঠ কয়লা আনতে হয় বাইরে থেকে। ফলে খরচ আরও বেড়ে যায়। তাছাড়া বর্ষাকালে কাঠকয়লা পাওয়াও খুব ঝামেলার ব্যাপার হয়ে দাড়ায়। ১৯৫৫ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত কাঁচামাল পাওয়া যেত সরকার মারফত। কিন্তু তারপর সরকারি বণ্টন বন্ধ হয়ে যায়। তখনই কারিগরদের দ্বারস্থ হতে হয় মহাজনদের কাছে। একদিকে কাঁচামালের অভাব অন্যদিকে স্বল্প মজুরি। তার মধ্যে ষাটের দশকের শেষাশেষি স্টেনলেস স্টিল, হিণ্ডেলিয়াম প্রভৃতি ঝকঝকে অথচ সস্তা বাসনপত্র কাঁসার বাজারে ভাগ বসালো। ফলে এই শিল্প এখন প্রায় শেষ হতে বসেছে।

মালদা জেলা আমের জন্য বিখ্যাত। আম থেকে নানা ধরনের

খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করার শিল্পও মালদা জেলার একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প। ছোটবড় বিভিন্ন কারখানায় আমসত্ত, আমের আচার, কাসুন্দি, জ্যাম, জেলি, সস্ ইত্যাদি তৈরি করা হয়। আম্রজাত খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুতকারক সমবায় সমিতির উদ্যোগে পুরনো মালদা থানায় এক অতি আধুনিক কারখানা তৈরি হয়েছে।

জেলার রেশম শিল্প: গাঙ্গেয় সমভূমিতে মালদা জেলার অবস্থান হওয়ার জন্যই জেলার জমি পাললিক (alluvial) এবং এখানে দো-আঁশ মাটি দেখতে পাওয়া যায়। তুঁতের চাষের পক্ষে এ ধবনের মাটি অত্যন্ত উৎকৃষ্ট। সমগ্র পশ্চিমবঙ্গেব প্রায় ৬৫% তুঁতই চাষ হয় মালদা জেলায়। তুঁত চাষীরা বছরে চারবার এই বাণিজ্যিক শস্যকে (commercial crop) ঘরে তোলে। এদেব মধ্যে কেউ কেউ নিজেরাই গুটিপোকা পালন করে আর কেউ বা গুটিপোকা পালনের জন্য অন্যদের কাছে তা বিক্রি করে দেয়। তাছাড়া বর্তমানে সরকারি উদ্যোগে ৩৪টি গুটিপোকা পালন কেন্দ্র তৈরি হয়েছে। এই কেন্দ্রগুলির তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে রয়েছে Intensive Sericulture Development Project। তাছাড়া Khadi and Village Industries Commission এব পৃষ্ঠপোষকতায় গুটি ক্রয়ের যৌথ কমিটি গড়ে উঠেছে। এর ফলে দরিদ্র রেশম শিল্পীরা ন্যায্য মূল্যে গুটি ক্রয় করার সুযোগ পাচ্ছে।

গুটি থেকে তৈরি হয় রেশমি সুতা। তারপর ওগুলোকে রং করা হয়। রঙিন সুতাগুলো দিয়েই তৈরি হয় রেশমি কাপড়। জেলায় একটি মিল ও অসংখ্য তাঁত আছে,—যেখানে বেশমি কাপড় বোনা হয়। এছাড়া বোনার জন্য মালদাই রেশম চালান হয় মুর্শিদাবাদ, বাঁকুড়া ও বীরভূম জেলায়।

যারা গুটিপোকা পালন করে গুটি তৈরি করে তাদের বোস্নী বলা হয়। যে বছর চারবারই (অর্থাৎ, জ্যৈষ্ঠ ভাদ্র অঘ্রান ও চৈত্র) তারা এই বাণিজ্য শস্য ঘরে তুলতে পারে বা জমির মালিক থেকে তুঁতপাতা কিনে নিতে পারে, সে বছর তাদের খুব অসুবিধা হয় না। কিন্তু যে বছর শস্য নষ্ট হয়ে যায় সে বছর এরা খুবই ঝামেলায় পড়ে। যাদের তুঁতের চাষ আছে এবং একই সঙ্গে গুটিপোকা পালন করে তারা মোটামুটি

অবস্থাপন্ন, কিন্তু যারা কেবলই গুটিপোকা পালন করে তারা অত্যন্ত দরিদ্র। যাদের তুঁত জমি আছে, সাধারণত দেখা যায় যে, তুঁত জমি ছাড়াও তাঁদের অন্যান্য কৃষি জমি বা আমবাগান থাকে। কিন্তু যারা কেবলই গুটিপোকা পালনের মাধ্যমে গুটি তৈরির কাজে লিপ্ত, অর্থাৎ বোস্‌নীরা, তুঁত চাষের ক্ষতি হলে খুবই ঝামেলায় পড়ে। অনেক সময়ই আর্থিক অনটনের জন্য বোস্‌নীদের মহাজনদের কাছে হাত পাততে হয়। মহাজনরা বিভিন্ন কিস্তিতে বোস্‌নীদের টাকা ধার দেয়। ফলে গুটি তৈরি হয়ে গেলে মহাজনরা সস্তায় গুটিগুলো কিনে নেয়। ফলে মহাজনদের খুব সুবিধা হয়। কারণ গুটি কেনার সময় একসঙ্গে যে অনেক টাকা তাদের লাগতো সেটা লাগে না, বিভিন্ন কিস্তিতে কিছু কিছু টাকা দিয়ে রাখার জন্য তদুপরি অসময়ে ধার দেওয়ার অজুহাতে, তাবা খুবই সস্তায় গুটি কেনে বোস্‌নীদেব কাছ থেকে। অনেক সময় গুটি তৈরি করতে যে খরচ লেগে যায়, সেই খবচাও বোস্‌নীদের ওঠে না স্বল্পমূল্যে মহাজনকে গুটি বিক্রি করার জন্য।

মালদা জেলায় বোস্‌নীরা নিজেদের একটি সংগঠনও গড়ে তুলেছে। কিন্তু বোস্‌নীদের এই সংগঠন খুবই দুর্বল। তাদেব সংগঠনের কার্যাবলী একটি অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে বয়েছে। কারণ এখনও তারা ঠিক করে উঠতে পারেনি যে তাদের দারিদ্র্য অপসারণের জন্য সংগ্রাম কোন পদ্ধতিতে হবে—কৃষক সভা না শ্রমিক সংগঠন (Trade union)।

৭

ব্যবসায় ও বাণিজ্য

মালদা জেলার শিল্প সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে স্বাভাবিকভাবেই জেলার বাণিজ্যিক ইতিহাস কিছুটা আলোচিত হয়েছে। এ কথাও বলা হয়েছে যে প্রাচীনকাল থেকেই আজকের মালদা জেলার যথেষ্ট গুরুত্ব ছিল। Streynsham Master এর ডায়রিতে (১৬৭৫ থেকে ১৬৮০) মালদা জেলার বাণিজ্যিক গুরুত্বের যথেষ্ট উল্লেখ আমরা পাই। Edwards নামে আরেক সাহেবের লেখাতেও দেখা যায় যে, ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে মালদা অঞ্চল নানা ধরনের বস্ত্রের এক গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠেছিল। বিভিন্ন ফার্সী সূত্র থেকে জানা যায় যে তারও আগে চতুর্দশ শতকে. বাংলার স্বাধীন সুলতানদের আমলে কালীন্দ্রী ও মহানন্দার সঙ্গমে আজকের পুরনো মালদা বা ওল্ড মালদা একটি গুরুত্ব-পূর্ণ বন্দর হিসেবে গড়ে উঠেছিল। মীরকাশিম যখন বাংলার নবাব, তখন নবাবগঞ্জ (বর্তমানে বাংলাদেশে) ছিল সয়ের পঞ্চেত্রার অন্যতম— অর্থাৎ বাংলাদেশের প্রধান পাঁচটি বন্দরের একটি।

Hunter-এর Statistical Account of the Distict of Malda থেকে জানা যায় যে মালদা জেলা ভারতবর্ষের বিভিন্ন বাজারে কাঁচা রেশম, গুটিপোকা, রেশমি বস্ত্র, নীল, পিতল ও কাঁসার বাসনপত্র, বিভিন্ন রবি শস্য ও ডাল এবং আম রপ্তানি করত। রেশম ও রেশমজাত দ্রব্যের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বাজার ছিল আমানীগঞ্জের হাট। এই হাটে মুর্শিদাবাদ, রাজশাহী প্রভৃতি পার্শ্ববর্তী জেলা থেকেও প্রচুর ক্রেতা আসত, সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকে ইউরোপীয় কোম্পানিগুলোর উদ্যোগে যে সব রেশম জাত দ্রব্য তৈরি হতো, সেগুলো সরাসরি যেত কোলকাতায়। কোলকাতা হয়ে সেগুলো চলে যেত সুদূর ফ্রান্সে। নীল রপ্তানি হতো মূলত কোলকাতায়। পিতল ও কাঁসার বাসনপত্রের প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র

ছিল নবাবগঞ্জ — যেখানে এগুলো তৈরি হতো। খাদ্যশস্যের প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্রগুলোর মধ্যে ছিল ইংরেজবাজার, পুরনো মালদা, বোহনপুর ও নবাবগঞ্জ। জেলার আমদানিকৃত পণ্যের মধ্যে ছিল সুতীবস্ত্র, পাট, নারকেল, চিনি, আদা, তেল, ঘি, কাগজ প্রভৃতি। মালদা জেলার আমদানি অনুপাতে রপ্তানির পরিমাণ ও মূল্য ছিল অনেক বেশি। অধিক রপ্তানি থেকে আসা উদ্বৃত্ত মূলধন কিন্তু সাধারণত জেলার ব্যবসায়ীদের হাতে সঞ্চিত হতো না। লাভের একটা বিরাট অংশ চলে যেত সে সমস্ত ব্যবসায়ীর হাতে যারা নিজেদের ভাগ্য অন্বেষণ করতে রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ থেকে ছুটে এসেছিল।

Carter সাহেবের লেখাতে দেখা যায় যে বিংশ শতাব্দীতেও মালদা জেলার বাণিজ্যিক কাঠামো মোটামুটি অপরিবর্তিতই ছিল। আমদানি বা রপ্তানির পণ্যেরও বিশেষ তারতম্য ঘটেনি বিশ শতকের গোড়ার দিকে।

বর্তমানে মালদা জেলা পশ্চিম দিনাজপুর জেলা থেকে চাল আমদানি করে। আর রপ্তানি করে কাঁচা রেশম মুর্শিদাবাদ, বীরভূম ও বাঁকুড়া জেলার তাঁতিদের জন্য। জেলার সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রপ্তানিকৃত পণ্য হলো আম। শুধু আম নয় — আম থেকে তৈরি বিভিন্ন ধরনের খাদ্যদ্রব্য বিদেশের বিভিন্ন বাজারে পাঠানো হয়। আম্রজাত খাদ্যের কদর ইংল্যণ্ড, অস্ট্রেলিয়া, সিঙ্গাপুর ও জাপানে খুব বেশি। মালদার আম ও আম থেকে তৈরি খাবারের কদর ইদানীং সোভিয়েট রাশিয়াতেও খুব বেড়েছে।

বর্তমানে খাদ্যশস্যের সব থেকে বড় বাজার হল ইংরেজবাজার। ইংরেজবাজার থানার অন্তর্গত নেতাজি বাজার ও চিত্তরঞ্জন বাজারে বছরে দেড় লক্ষাধিক কুইন্টাল পরিমাণের খাদ্যশস্য বেচাকেনা হয়। চাল, ডাল, গুড়, মাছ ইত্যাদি বাণিজ্যের জন্য ইংরেজবাজার বিখ্যাত। আমের সব থেকে বড় বাণিজ্যকেন্দ্র ওল্ড মালদা। আভ্যন্তরিক চাহিদা মেটানো ছাড়াও মালদার আম বিভিন্ন জায়গায় রপ্তানি হয় একথা আগেও বলা হয়েছে। ফরাক্কা সেতু তৈরি হবার পর মালদার সঙ্গে দক্ষিণ বঙ্গের, বিশেষত কোলকাতা শহরের যোগাযোগ সুদৃঢ় হয়। ফলে মালদার বিভিন্ন পণ্য বিশেষত আম ও রেশমের রপ্তানির পরিমাণ প্রচুর পরিমাণে বেড়ে গেছে।

আভ্যন্তরিন বাণিজ্যের কেন্দ্র হিসাবে ইংরেজবাজার ও ওল্ড মালদার বাইরে যে সব জায়গা বিখ্যাত সেগুলো হলো রতুয়া থানার অন্তর্গত সামসীর হাট, খরবা থানার অন্তর্গত চাঁচোল হাট, হরিশ্চন্দ্রপুর থানার অন্তর্গত তুলসীহাটা হাট, হবিবপুর থানার অন্তর্গত বুলবুলচণ্ডী হাট ও আইহো হাট, বামুনগোলা থানার পাকুয়া হাট, গাজোল থানার গাজোল হাট, কালিয়াচক থানার গোঁসাইয়ের হাট ও সাহেবগঞ্জ হাট বিখ্যাত। এই সমস্ত হাটেই পাইকারি ও খুচরো বিক্রি চলে। এদের অধিকাংশই খাদ্যশষ্যের বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে বিখ্যাত। গোঁসাইয়ের হাটে গরু মহিষ প্রভৃতির বেচাকেনা চলে। পাকুয়া হাটও গরু মহিষ এবং হাঁস মুরগির (Poultry birds) এক গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য কেন্দ্র।

মালদা জেলায় স্থানীয় ও বহিরাগত দুই ধরনের ব্যবসায়ীই দেখতে পাওয়া যায়। বহিরাগত ব্যবসায়ীরা এসেছিল বহু আগে—অষ্টাদশ ঊনবিংশ শতাব্দীতে। পলাশীর যুদ্ধের পর ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বাংলাদেশে ঔপনিবেশিক শাসনের সূচনা করে এবং বক্সার যুদ্ধের পর দেওয়ানি লাভের মারফৎ সেই শাসনকে তারা সুদৃঢ় করে। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষ থেকে সুলভে কাঁচা মাল নিজের দেশে নিয়ে গিয়ে শিল্প-বিপ্লবের গতিকে অব্যাহত রাখা। তাছাড়া শিল্পজাত দ্রব্য বিক্রির জন্য ভারতবর্ষের সুবিশাল বাজারও ইংরেজদের প্রলোভিত করেছিল। সুতরাং অবাধ লুণ্ঠনের মানসিকতা নিয়ে তারা বাংলাদেশে রাজনৈতিক আধিপত্য কায়েম করেছিল। ফলে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের সঙ্গে বিভিন্ন অঞ্চলের মত মালদা জেলার বাণিজ্যিক কাঠামোরও যথেষ্ট পরিবর্তন এসেছিল। ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির উদ্যোগে রেশম ও নীলের নতুন নতুন কারখানা তৈরি হতে লাগল। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির যারা কর্মচারি, তারাও স্বাধীনভাবে বাণিজ্য করতে লাগল। কিন্তু সুদূর ইংলণ্ড থেকে এসে বাণিজ্য করতে গিয়ে তারা বিভিন্ন অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছিল। তাছাড়া তাদের লোকবলও ছিল কম। তাই তাদের দরকার ছিল কিছু দেশীয় সহযোগীর। কিন্তু মালদা জেলার স্থানীয় ব্যবসায়ীরা দেশীয় সহযোগীদের স্থান পূরণ করতে পারল না। উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান থেকে লোকেরা এসে ইংরেজদের সহযোগী হলো। কেন জেলার স্থানীয় ব্যবসায়ীরা এই ব্যাপারে পিছিয়ে

পড়ল, তা নিয়ে যথেষ্ট তর্কের অবকাশ আছে। ইংরেজ ও অন্যান্য ইয়োরপীয় ব্যবসায়ীদের উদ্যোগে জেলায় যখন রেশম শিল্পের কারখানা গড়ে উঠলো এবং বাষ্পচালিত ইঞ্জিন যখন নতুন ধরনের উৎপাদনের সূচনা করলো, তখন স্বাভাবিকভাবেই জেলার তাঁতিরা প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়তে লাগলো। দেওয়ানি লাভের পর কোম্পানি ক্রমবর্ধমান হারে রাজস্ব আদায় করতে লাগলো। বর্ধিত রাজস্ব দিতে গিয়ে কৃষকরা তাদের উৎপাদিত সমস্ত ফসল বিক্রি করতে বাধ্য হলো। ইংরেজ বণিকরা তখন সেই সুযোগে সস্তায় সেই ফসল কিনে নিয়ে মজুত করে রাখল। যখন বাংলা ও বিহারে খাদ্যাভাব চরমে উঠলো, তখন বিদেশি বণিকরা চড়া দামে তাদের মজুত ফসল বিক্রি করতে লাগলো। তারা বাংলা-বিহারের বিভিন্ন স্থানে চাল বেচাকেনার অসংখ্য একচেটিয়া ব্যাবসা কেন্দ্র খুলে বসলো। ১৭৬৯ খ্রীস্টাব্দে প্রচুর মুনাফার লোভে আকৃষ্ট হয়ে বছরের গোড়াতেই ইংরেজ ব্যবসাদাররা সমস্ত ফসল মজুত করে রাখলো। কিন্তু ফসলের দাম এত চড়ানো হলো যে, মানুষের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে সেগুলো রইলো না। ফলে দেখা দিল ১৭৭৬ এর মারাত্মক দুর্ভিক্ষ—যা ইতিহাসে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর নামে খ্যাত। সুতরাং একদিকে বিদেশিদের উন্নতমানের কারিগরি বিদ্যার প্রয়োগ জেলার তাঁতিদের কপর্দকহীন করেছিল, অন্যদিকে তাদের অসৎ উপায়ে মুনাফা লাভের নীতি জেলার ব্যবসায়ী ও কৃষকদের নিঃস্ব করেছিল। সুতরাং বিদেশি পুঁজির সঙ্গে সহযোগিতা করার জন্য যে দেশি পুঁজির দরকার ছিল—সেই পুঁজি জেলার মানুষের কাছে ছিল না। তখনই নিজেদের পুঁজির সম্ভার নিয়ে রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ প্রভৃতি প্রদেশ থেকে ছুটে এসেছিল ব্যবসায়ীর দল—বিদেশি পুঁজিপতিদের সঙ্গে সহযোগিতা করে নিজেদের পুঁজির পরিমাণ আরও বাড়িয়ে নেওয়ার তাগিদে। এই সমস্ত দেশীয় মুৎসুদ্দিরা কীভাবে জেলার রেশমশিল্পের ক্ষেত্রে বিদেশি বণিকদের সহযোগিতা করতো, সে ব্যাপারে শিল্প-সংক্রান্ত আলোচনা করার সময় কিছুটা আলোকপাত করা হয়েছে। Hunter সাহেবের লেখা থেকে আমরা জানতে পারি যে, উনবিংশ শতকের শেষ দিকেও এই সমস্ত বহিরাগত ব্যবসায়ীরা জেলার আমদানি-রপ্তানির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছিল। Carter এর দেওয়া তথ্য থেকে জানা যায় যে, বিংশ শতকের

গোড়ায়ও মালদা জেলার বাণিজ্যিক জগতে এদের আধিপত্য অটুট ছিল।

এখনও মালদা জেলায় আগরওয়ালা, শেঠিয়া, প্রভৃতি পদবিধারী প্রচুর ব্যবসায়ী দেখা যায়—যাদের পূর্বপুরুষরা নিজেদের ভাগ্য তৈরি করতে এসেছিল কোম্পানির আমলে। খাদ্যশস্য, ওষুধ, আম ও আম্র-জাত দ্রব্য প্রভৃতি নানা ধরনের বাণিজ্যের সঙ্গে এই ব্যবসায়ীরা যুক্ত। তবে স্থানীয় ব্যবসায়ীও প্রচুর রয়েছে।

অধুনা মালদা জেলায় ব্যবসায়ীদের ঠিকেদারি করার দিকে ঝোঁক খুব বেড়েছে। ফরাক্কায় যে সুবিশাল বিদ্যুৎ উৎপাদন-কেন্দ্র তৈরি হচ্ছে —তার সঙ্গে ব্যবসায়ীরা ঠিকেদার হিসেবে সংযুক্ত থেকে নিজেদের ভাগ্য তৈরি করতে চাইছে। তাছাড়া সরকারি সেচ প্রকল্পগুলিও ঠিকেদারি ব্যবসায়ের দিকে যাবার জন্য ব্যবসায়ীদের উৎসাহিত করছে। ইংরেজ-বাজার শহরে কোন সুদৃশ্য অট্টালিকা চোখে পড়লে অনুমান করা যেতে পারে যে এটি জেলার কোনো ধনী ঠিকাদারের বাসস্থান।

৮

জেলার ইতিহাস

রাজনৈতিক ইতিহাসের কালাণুক্রমিক বিবরণ: প্রাচীন যুগের ইতিহাসবেত্তারা মনে করেন, বর্তমান মালদা জেলা প্রাচীন গৌড় জনপদের অন্তর্গত ছিল। পানিনি স্যত্রে গৌড়পুর নামে একটি অঞ্চলের উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু এই গৌড়পুর বর্তমান বাংলার কোনো অংশ কি না, এ বিষয়ে ইতিহাসবিদেরা আদৌ নিঃসংশয় নন। তাছাড়া কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে গৌড়ে প্রাপ্ত এক বিশেষ ধরনের রৌপ্যের উল্লেখ আছে। অর্থশাস্ত্রে স্পষ্টই বলা আছে যে এই গৌড পূর্ব-ভাবতে অবস্থিত। সুতরাং ধরে নেওয়া অসঙ্গত নয় যে, কৌটিল্যের উল্লিখিত গৌড় এবং বর্তমান মালদা জেলার গৌড় একই জায়গা, আর এই অঞ্চল মৌর্য সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। গৌড় যে গুপ্ত-সাম্রাজ্যেরও অন্তর্ভুক্ত ছিল তার প্রমাণ মেলে বরাহমিহিরের লেখায়। বরাহমিহির তাঁর বৃহৎসংহিতায় (আনুমানিক ষষ্ঠ শতক) গৌড়, পৌণ্ড্রক, তাম্রলিপ্তক, বর্ধমান, বঙ্গ ও সমতট—এই ছয়টি জনপদের উল্লেখ করেছেন। বরাহমিহিরের লেখা থেকে ইতিহাসবিদরা ধারণা করেছেন যে বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ ও মালদার একাংশ নিয়ে গৌড়ক জনপদ গড়ে উঠেছিল। তবে বর্তমান মালদা জেলার গোটাটাই গৌড়ের অন্তর্গত ছিল না। আধুনিক মালদা জেলার উত্তর পূর্বের কিয়দংশ পৌণ্ড্রক বা পুণ্ড্রবর্ধনের অন্তর্গত ছিল। বগুড়া-রাজশাহীর উত্তরাংশ, দিনাজপুর এবং উত্তর পূর্ব মালদা নিয়ে পুণ্ড্রবর্ধন গঠিত ছিল। বরেন্দ্র ভূমি বা বরেন্দ্রী প্রাচীন পুণ্ড্রবর্ধনেরই একটি সুবৃহৎ অংশ—কখনও বা সমার্থক। এই বরেন্দ্রভূমি বা বরেন্দ্রীই মধ্যযুগীয় আরবি ভাষী ঐতিহাসিকদের বরিন্দ। জেলার ভূপ্রকৃতি আলোচনা প্রসংগে বরিন্দ অঞ্চলের সঙ্গে আমরা পরিচিত হয়েছি।

বর্তমান মালদা জেলায় পাণ্ডুয়া নামে যে জায়গা আছে, তা জেলার

বরিন্দ এলাকায় অবস্থিত। এর থেকে অনেকে ধারণা করেছেন যে আজকের পাণ্ডুয়া প্রাচীন পুণ্ড্রবর্ধনেরই পরিবর্তিত রূপ। বিখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েঙ সাঙ সপ্তম শতকের প্রথমার্ধে ভারতবর্ষে এসে পুণ্ড্রবর্ধনের যে বর্ণনা দিয়েছিলেন, তা থেকে মনে হয় পুণ্ড্রবর্ধন বরিন্দেরই একটি অংশবিশেষ। তবে পাণ্ডুয়ার প্রথম নির্ভরযোগ্য ইতিহাস আমরা পাই ১৩৫৩ খ্রীস্টাব্দে—বাংলার রাজা সামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহের সময়। এই সময়েই পাণ্ডুয়া ছিল বাংলার রাজধানী।

মহারাজ শশাঙ্কের আমলে গৌড় একটি স্বাধীন রাজ্য হিসেবে গুরুত্ব লাভ করেছিল। শশাঙ্ক সিংহাসনে বসেন আনুমানিক ৬০৬ খ্রীস্টাব্দে। শশাঙ্ক ছিলেন হর্ষবর্ধনের সমসাময়িক। শ্রীহর্ষের সভাকবি বাণভট্ট তাঁর 'হর্ষচরিতে' শশাঙ্ককে গৌড়াধিপ নামে বর্ণিত করেছেন। যদিও শশাঙ্কের নাম কোথাও উল্লিখিত হয়নি। আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প থেকে জানা যায় হর্ষবর্ধনের সঙ্গে পূব ভারতের সোম নামে এক রাজার যুদ্ধ হয়েছিল। ঐতিহাসিকদের অনুমান এই সোম এবং শশাঙ্ক একই ব্যক্তি। শশাঙ্ক থানেশ্বরের রাজা রাজ্যবর্ধনকে যুদ্ধে পরাস্ত ও নিহত করেন। রাজ্যবর্ধনের অনুজ হর্ষবর্ধন গৌড় আক্রমণ করে ভ্রাতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিলেন। তখনই দুই পক্ষে যুদ্ধ বাধে। রজনীকান্ত চক্রবর্তী তাঁর 'গৌড়ের ইতিহাস' গ্রন্থে বলেছেন যে হর্ষবর্ধন শশাঙ্ককে যুদ্ধে পরাস্ত করে গৌড় অধিকার করেছিলেন। কিন্তু ঐতিহাসিকদের এ বিষয়ে মতান্তর আছে। অধিকাংশেরই বিশ্বাস শশাঙ্ক হর্ষবর্ধনের আক্রমণ প্রতিহত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। ৬১৯ খ্রীস্টাব্দ থেকে ৬৩৭ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে কোনো এক সময়ে শশাঙ্কের মৃত্যু ঘটে। শশাঙ্কের মৃত্যুর পর আনুমানিক ৬৭১ খ্রীস্টাব্দে মগধরাজ আদিত্য সেন গৌড় অধিকার করেন। কল্হনের রাজতরঙ্গিণী থেকে জানা যায় যে, অষ্টম শতকের গোড়ার দিকে কাশ্মীর রাজ জয়পীড় গৌড়ের পাঁচজন প্রধান সামন্তপ্রভুকে পরাস্ত করে পুণ্ড্রবর্ধনের রাজকন্যাকে বিবাহ করেন। আনুমানিক ৭৪৮ খ্রীস্টাব্দে নির্মিত কাঠমাণ্ডু শিলালিপি থেকে জানা যায় যে তৎকালীন নেপালরাজ জয়দেব তদানীন্তন গৌড়েশ্বর শ্রীহর্ষদেবের কন্যার সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন।

যাই হোক, শশাঙ্কের মৃত্যুর পর গৌড়ে এক নৈরাজ্যের সৃষ্টি

হয়েছিল। প্রায় একশো বছর ধরে এই নৈরাজ্য চলেছিল। সপ্তম শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে অষ্টম শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত এই যুগ বাংলার ইতিহাসে মাৎস্যন্যায়ের যুগ হিসেবে চিহ্নিত। খলিমপুর লিপি* থেকে জানা যায় যে এই বিশৃঙ্খল যুগের অবসানকল্পে প্রকৃতি-পুঞ্জ গোপালদেবকে গৌড়ের রাজা নির্বাচিত করেছিল। প্রকৃতির অভিধানগত অর্থ হলো প্রজা। সেই অনুযায়ী একদল ঐতিহাসিক এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিল যে একদল প্রজা মাৎস্যন্যায়ের যুগে উৎপীড়িত হয়ে শান্তি-শৃঙ্খলা আনার তাগিদে গোপালকে গৌড়ের রাজা নির্বাচিত করেছিলেন। নীহাররঞ্জন রায়ের মতে গোপালকে নির্বাচনের নায়ক ছিলেন একদল প্রভাবশালী সামন্তপ্রভু।

গোপাল ছিলেন দয়িতবিষ্ণুর পুত্র ও বপ্যটের পৌত্র। সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিত' থেকে জানা যায় যে, গোপালের আদিবাসস্থান ছিল বরেন্দ্রী। পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন এই গোপাল। গোপালের বংশধরেরা পরবর্তী বেশ কয়েক শতাব্দী গৌড়ে পরাক্রমের সঙ্গে রাজত্ব করেছিলেন। গোপালের পর গৌড়ের রাজা হন তাঁর পুত্র ধর্মপাল। এছাড়া পালবংশের গুরুত্বপূর্ণ রাজাদের মধ্যে ছিলেন দেবপাল, বিগ্রহপাল, মহীপাল, রামপাল, কুমারপাল ও মদনপাল। একাদশ শতকের শেষ দিকে মহীপাল যখন রাজা হন, তখন তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে ছিলেন বরেন্দ্রীর কৈবর্ত সামন্তরা। এদের নেতা ছিলেন দিব্য বা দিব্বোক। এই বিদ্রোহ দমন করতে গিয়ে মহীপাল নিহত হয়েছিলেন। দিব্য যে কোনো প্রজাবিদ্রোহ বা গণসংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এরকম কোনো প্রমাণ ঐতিহাসিকরা পাননি। ঐতিহাসিকদের ধারণা পালরাজ্যের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে দিব্য একজন প্রভাবশালী সামন্তপ্রভু হিসেবেই বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন। তবে বরেন্দ্রী যে দিব্বোকের অধিকারে এসেছিল, এ বিষয়ে কোনই সংশয় নেই। পালরাজ রামপাল দিব্যর হাত থেকে বরেন্দ্রী উদ্ধার করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন, কিন্তু ব্যর্থ হন।

---

* খলিমপুর কিছুদিন আগেও মালদা জেলার ভোলাহাট থানার অন্তর্গত ছিল। ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দে দেশভাগের পর এই থানা পাকিস্তানে চলে যায়। খলিমপুর এখন বাংলাদেশে।

দিব্যপুত্র রুদোকের আমলেও রামপাল বরেন্দ্রী করায়ত্ত করতে পারেন নি। রুদোকের মৃত্যুর পর তার ভাই ভীমকে পরাস্ত করে বন্দী করেছিলেন রামপাল। আবার বরেন্দ্রী পালরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হলো। নিজের নাম অনুসারে রামপাল বরেন্দ্রীর একটি অঞ্চলের নামকরণ করেছিলেন রামাবতী। রামাবতী এখন মালদা জেলায় অবস্থিত।

মদনপাল ছিলেন পালবংশের শেষ রাজা, তাঁর রাজত্বকাল আনুমানিক ১১৪০ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১১৫৫ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত। পালরাজাদের পর গৌড়ে রাজত্ব করতে শুরু করেন সেন রাজারা। সেন রাজারা কর্ণাটক্ষত্রিয় হিসেবে নিজেদের পরিচয় দিয়েছিলেন। সামন্তসেন কর্ণাটলক্ষীর লুণ্ঠনকারীদের দমন করেছিলেন এরকম একটা কথা সেনলিপিতে দেখতে পাওয়া যায়। পালরাজাদের সৈন্যদলে এবং আমলাতন্ত্রে প্রচুর ভিন্ প্রদেশী লোক নিযুক্ত হয়েছিলেন। চন্দ্রবংশীয় কোন সেন পরিবার ঐ সূত্রেই সুদূর দাক্ষিণাত্যের কর্ণাট থেকে রাঢ় ভূমিতে বসতি স্থাপন করেছিলেন। এই সেনপরিবারে সামন্ত সেনের জন্ম, শেষ দিকের পালরাজাদের দুর্বলতার সুযোগে নিজেকে পূর্ববঙ্গের এক শক্তিশালী সামন্তপ্রভু হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। সামন্তসেনের পুত্র হেমন্তসেন সম্পর্কে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। হেমন্তসেনের পুত্র বিজয়সেন মদনপালকে পরাস্ত করে গৌড় অধিকার করেন।

বিজয়সেনের ছেলে বল্লালসেনের রাজত্বকালের সময় ১১৫৮ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১১৭৯ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত। বল্লালসেনের রাজধানী ছিল বল্লালবাটি। এই বল্লালবাটি আধুনিক মালদা জেলার জেলা সদর ইংরেজবাজারের দু-তিন মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। আবিদ আলির মতে বল্লালবাটি গৌড়ের প্রাচীনতম অংশ।

বল্লালসেন সপত্নীক বাণপ্রস্থে চলে গেলে গৌড়ের রাজা হন লক্ষ্মণসেন। লক্ষ্মণসেনের রাজধানী ছিল লক্ষ্মণাবতী। লক্ষ্মণসেন ছিলেন প্রাচীন গৌড়ের শেষ হিন্দু রাজা। মিনহাজ-উদ্-দিনের বর্ণনা এবং ইসমী প্রণীত ইতিহাস গ্রন্থ ফুতুহ্-উস্-সালাতিন থেকে জানা যায় যে ত্রয়োদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে তুর্কি জাতীয় যুদ্ধব্যবসায়ী মহম্মদ বক্তিয়ার খলজির হাতে লক্ষ্মণসেন পরাজিত হন। তখন দিল্লির মসনদে ছিলেন কুতবুদ্দিন আইবক। ১২০২ খ্রীস্টাব্দে নিজেকে গৌড়ের শাসনকর্তা

হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন বক্তিয়ার খলজি। তখনই প্রাচীন গৌড়ে হিন্দু রাজত্বের পরিসমাপ্তি ঘটলো।

প্রাচীন গৌড়ের রাজনৈতিক ইতিহাসের সঙ্গে তৎকালীন অর্থনৈতিক এবং সামাজিক অবস্থার সম্পর্কেও কিছু কথা বলা দরকার। প্রাচীন গৌড়ে সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। সামাজিক-অর্থ-নৈতিক কাঠামোর সর্বোচ্চ স্তরে ছিলেন রাজা। আর সর্বনিম্ন স্তরে অসংখ্য ভূমিহীন চাষী। বিভিন্ন স্তরের সামন্তপ্রভুদের সহায়তায় রাজা সাধারণ মানুষের কাছ থেকে কর আদায় করতেন। সামাজিক সম্পদের উৎপাদন ও বণ্টনের ভিত্তিতেই প্রাচীন গৌড়ে বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছিল। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী সম্পর্কে তথ্য মোটামুটিভাবে পাওয়া যায় পালযুগ থেকে। পাল আমলে সমাজের সব থেকে সুযোগ প্রাপ্ত শ্রেণী ছিল সামন্তপ্রভুরা। কিন্তু সমস্ত সামন্তপ্রভু একই অর্থনৈতিক স্তরভুক্ত ছিলেন না। প্রধান ভুস্বামী ছিলেন মহাসামন্ত, মহামাণ্ডলিক প্রভৃতিরা। এর পরের স্তরেই ছিলেন রাণক, রাজনক, মাণ্ডলিক, সামন্ত প্রভৃতিরা। এর পর ছিলেন মহামহত্তর (বড় জমিদার) ও মহত্তর (ছোট জমিদার)। এ ছাড়া ছিলেন কুটুম্ব বা সম্পন্ন চাষী, ভাগীপ্রজা বা ভাগ-চাষী। ধর্মপালের খলিমপুরলিপিতে ক্ষেত্রকর নামে এক দরিদ্র শ্রেণীর উল্লেখ রয়েছে। এই ক্ষেত্রকরেরা খুব সম্ভবত ক্ষেতমজুর—যারা অন্যের জমিতে কাজ করতেন ও বিনিময়ে মজুরি নিতেন।

পাল ও সেন যুগে উপরিক, বিষয়পতি, ভুক্তিপতি, অমাত্য, মহামন্ত্রী প্রভৃতি উচ্চপদস্থ রাজ কর্মচারীরাও যথেষ্ট প্রভাবশালী ছিলেন। পাল ও সেন যুগের সাহিত্যে শিল্পী ও শ্রেষ্ঠী (বণিক) এই দুই শ্রেণীর উল্লেখ থেকে বোঝা যায় যে সেই সময়ে গৌড়ে বাণিজ্য ও শিল্পের বিকাশ ঘটেছিল।

পাল ও সেন যুগে ভাগ, ভোগ, কর ও হিরণ্য—এই চার ধরনের রাজস্বের উল্লেখ পাওয়া যায়। ভাগ ছিল রাজাকে দেয় উৎপাদিত ফসলের এক ষষ্ঠাংশ। কর ছিল টাকার মাধ্যমে দেয় রাজস্ব। ভোগ ও হিরণ্য সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না।

মধ্য যুগ : বক্তিয়ার খলজির হাতে লক্ষ্মণসেনের পরাজয়ের সাথে গৌড়ে

মুসলিম শাসনের সূত্রপাত ঘটলো। লখনৌতি হলো গৌড়ের নতুন রাজধানী। এই লখনৌতিই লক্ষ্মণসেনের লক্ষ্মণাবতী। লখনৌতি বর্তমান মালদা জেলার ইংরেজবাজারের কাছে অবস্থিত। ১২০৭ খ্রীস্টাব্দে লখনৌতির শাসনকর্তা হলেন মহম্মদ সিরান। সিরানের পর আলি মর্দান। ১২১৩ খ্রীস্টাব্দে লখনৌতির মসনদে স্বাধীন সুলতান হিসেবে বসেছিলেন গিয়াসুদ্দিন ইয়াজ। ১২২৫ খ্রীস্টাব্দে দিল্লির সুলতান ইলতুৎমিস গিয়াসুদ্দিন ইয়াজকে তাঁর বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য করলেন।

১২২৭ খ্রীস্টাব্দে ইলতুৎমিসের ছেলে নাসিরুদ্দিন লখনৌতির শাসনকর্তা হলেন। কিন্তু একবছরের মধ্যেই তিনি মারা গেলেন। এরপরই লখনৌতির সিংহাসনের অধিকার নিয়ে চরম নৈরাজ্য আরম্ভ হলো। ১২৮৭ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত অন্তত নয়জন শাসক লখনৌতি শাসন করেছিলেন। এরা কখনও স্বাধীনভাবে, আবার কখনও দিল্লির বশ্যতা স্বীকার করে রাজত্ব চালিয়েছিলেন। এরা অধিকাংশই ছিলেন মামলুক অর্থাৎ মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন উপজাতির মানুষ। এ সমস্ত শাসকের মধ্যে মুঘিসুদ্দিন তুঘ্রিলের নাম উল্লেখযোগ্য।

চতুর্দশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে মুবারক শাহী বংশের সুলতানরা লখনৌতির মসনদে আসেন। এই সময় থেকেই বাংলার স্বাধীন সুলতানদের দুশো বছরের রাজত্বের আরম্ভ। মুবারকশাহী বংশের সুলতানদের মধ্যে বিখ্যাত ছিলেন—ফকিরুদ্দিন মুবারক শাহ্, ইক্তিয়ারউদ্দিন গাজী শাহ্ এবং আলাউদ্দিন আলি শাহ্।

এরপর শুরু হলো ইলিয়াশ শাহী আমল। সামসুদ্দিন ইলিয়াশ শাহ্ পাণ্ডুয়াতে তাঁর রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। দিল্লির সুলতান ফিরোজ শাহ্ তুঘলক পাণ্ডুয়া আক্রমণ করেছিলেন। কিন্তু ইলিয়াশ শাহ্ এই আক্রমণ প্রতিহত করে, গৌড়ে নিজের প্রতিপত্তি অক্ষুন্ন রেখেছিলেন। ইলিয়াশ শাহী বংশের অন্যান্য রাজাদের মধ্যে বিখ্যাত ছিলেন সিকন্দর শাহ্, গিয়াসুদ্দিন আজম শাহ্ এবং সৈফুদ্দিন হামজা শাহ্।

সৈফুদ্দিন হামজা শাহ্ নিহত হন তাঁর ক্রীতদাস শিহাবুদ্দিনের হাতে। কিছু দিনের মধ্যেই শিহাবুদ্দিন তাঁর হিন্দু অমাত্য গণেশ কর্তৃক

নিহত হন। গণেশ অল্প কয়েক দিনের জন্য হিন্দু শাসনের সূত্রপাত করেন। কিন্তু জৌনপুরের সুলতানের হাতে গণেশ পরাস্ত হন। গণেশের পর গণেশপুত্র যদু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন ও জালালুদ্দিন নাম নিয়ে শাসনকার্য শুরু করেন। রিয়াজ-উস্-সালাতিন থেকে জানা যায় জালালুদ্দিন রাজধানী পাণ্ডুয়া থেকে গৌড়ে নিয়ে এসেছিলেন।

এরপর ১৪৩৬ খ্রীস্টাব্দে গৌড় লখনৌতির সিংহাসনে বসেন মামুদ শাহী বংশের সুলতানরা। এদের মধ্যে সব থেকে সফল শাসক ছিলেন রুকনুদ্দিন বারবাক শাহ্। কিছু ঐতিহাসিক মনে করেন তাঁর সময়েই রাজধানী পাণ্ডুয়া থেকে গৌড়ে এসেছিল। রুকনুদ্দিন সাহিত্য ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। খুব সম্ভবত তাঁব সময়েই কৃত্তিবাস ওঝা বাংলায় রামায়ণ লিখেছিলেন।

১৪৯৩ খ্রীস্টাব্দে গৌড়ের অত্যাচারী হাবসি সুলতান শামসুদ্দিন মুজাফ্ফর শাহ্কে নিহত করেন তাঁর মন্ত্রী সৈয়দ হোসেন। তারপর তিনি আলাউদ্দিন হোসেন শাহ্ নাম নিয়ে গৌড়ের মসনদে বসেন।

বাংলার স্বাধীন সুলতানদের দুশো বছরের ইতিহাসে হোসেন শাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ সুলতান ছিলেন। কেবল একজন দক্ষ শাসক হিসেবেই নয়, সাহিত্য ও সংস্কৃতির একনিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক হিসেবেও তাঁর খ্যাতি ছিল সুবিদিত। তাঁর সময়েই ধর্ম সংস্কারক শ্রীচৈতন্য বৈষ্ণব ধর্মমতের প্রচলন করেন। হোসেন শাহের আমলেই শ্রীচৈতন্য মালদা জেলার রামকেলিতে এসে তাঁর দুই শিষ্য রূপ ও সনাতনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। এই ঘটনাকে স্মরণ করে এখনও মালদার রামকেলিতে প্রতি বছর জ্যৈষ্ঠের শেষ দিনে একটি মেলা বসে। মালদায় চৈতন্যের আর একজন বিখ্যাত শিষ্য ছিলেন নিত্যানন্দ, তাঁর বংশধরেরা এখনও মালদায় আছে। এই পরিবার গয়েশপুরের গোঁসাই পরিবার নামে খ্যাত। বিখ্যাত বাঙালি কবি চণ্ডীদাস হোসেন শাহের সমসাময়িক ছিলেন। মালদা জেলায় গুয়ামালতি বলে একটি জায়গা আছে। হোসেন শাহের মালতি নামে এক হিন্দু ধাত্রী ছিলেন। অনেকের ধারণা এই মালতির নামেই জায়গাটার নাম গুয়ামালতি হয়েছে।

১৫১৯ খ্রীস্টাব্দে গৌড়ের সিংহাসনে বসেন হোসেন পুত্র নুসরৎ শাহ্। তাঁর সময়ে দিল্লির লোদী রাজবংশ দুর্বল হয়ে পড়েছিল। ১৫২৬ খ্রীস্টাব্দে

মধ্য এশিয়া থেকে আগত মোগল সমর নায়ক বাবর দিল্লির সুলতান ইব্রাহিম লোদীকে পরাস্ত করে ভারতে মোগল শাসনের সূচনা করেন। ১৫২৭ খ্রীস্টাব্দে বাবর গৌড় আক্রমণ করে নুসরৎকে পরাজিত করেন। নুসরৎ শাহ্ বাবরের বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হন।

এরপর অল্প কয়েকদিনের জন্য গৌড় শাসন করেন আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহ্ এবং মাহমুদ শাহ্। এই সময়ে পূর্ব ভারতে শূর বংশীয় সর্দার শের শাহ্র নেতৃত্বে পাঠান শক্তি বিকাশ লাভ করেছিল। শের পুত্র জালাল খাঁ এবং শের শাহ্র বিশ্বস্ত সেনাপতি খাওয়াস খাঁ লখনৌতি অবরোধ করেছিলেন। সন্ত্রস্ত মাহমুদ শাহ্ গৌড় পরিত্যাগ করে চলে গেলেন। গৌড় বাংলা সাময়িকভাবে পাঠানদের করায়ত্ত হয়। সঙ্গে সঙ্গেই মধ্যযুগীয় গৌড়ের স্বাধীন সুলতানদের দুশো বছরের শাসনের অবসান ঘটে।

গৌড় বেশিদিন পাঠানদের হাতে রইলো না। ১৫৩৭ খ্রীস্টাব্দে মোগল সম্রাট হুমায়ুন গৌড় দখল করেন। গৌড়ের প্রাকৃতিক পরিবেশ হুমায়ুনকে আকৃষ্ট করেছিল। তিনি গৌড় নগরীর নামকরণ করেছিলেন 'জিন্নতাবাদ,' অর্থাৎ স্বর্গনগরী। ইতিমধ্যে হুমায়ুনের ভাই মির্জা হিন্দাল আগ্রায় বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। হুমায়ুন তখন জাহাঙ্গীর কুলিবেগকে গৌড়ের শাসনকর্তা নিযুক্ত করে আগ্রা অভিমুখে যাত্রা করেন। পাঠান সর্দার শের শাহ্ এই সুযোগে গৌড় দখল করে নিলেন। পরপর দুটি যুদ্ধে হুমায়ুনকে পরাস্ত করে শেরশাহ্ দিল্লিতেও পাঠান আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করলেন।

শেরশাহ্ যখন দিল্লির সম্রাট তখন গৌড়ের সুবাদার ছিলেন খিজির খান। ১৫৪১ খ্রীস্টাব্দে খিজির খান বিদ্রোহ ঘোষণা করলে শের শাহ্ এসে বিদ্রোহ দমন করলেন। প্রায় সমগ্র মধ্যযুগ ধরেই দিল্লির সম্রাটদের চোখে গৌড়নগরী ছিল 'বুলমাকপুর' বা বিদ্রোহের.জায়গা।

শের শাহ্ মারা গেলে, হুমায়ুন ১৫৫৬ খ্রীস্টাব্দে পাঠান রাজ সিকন্দর শূরকে পরাস্ত করে দিল্লিতে মোগল শাসন কায়েম করলেন। কিন্তু তিনি জীবদ্দশায় গৌড় অধিকার করতে পারেননি। গৌড় ছিল আফগান শূরদের দখলে। এদের মধ্যে সুলেমান কর্‌রানী (১৫৫৬-১৫৭২ খ্রীঃ) ছিলেন খুবই ক্ষমতাসম্পন্ন। সুলেমানের সময় আকবর দিল্লির সিংহাসনে

আসীন। বুদ্ধিমান সুলেমান কখনোই আকবরের বিরুদ্ধাচরণ করেননি। সুলেমান তাঁর রাজধানী গৌড় থেকে সরিয়ে এনেছিলেন টাঁড়ায়। টাঁড়ার একাংশ বর্তমান মালদা জেলার অন্তর্গত। বাকি অংশ গঙ্গাবক্ষে নিমজ্জিত।

সুলেমানের পর টাঁড়ার মসনদে বসেন বায়োজিদ। বায়োজিদের পর দাউদ খাঁ। দাউদ খাঁ ছিলেন অযোগ্য শাসক। সম্রাট আকবরের সেনাপতি মুনিম খাঁ দাউদ খাঁকে পরাজিত করে গৌড়বঙ্গকে মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। মুনিম খাঁ টাঁড়াতেই মারা গেলেন। বর্ষাকালে টাঁড়াতে মোগল সৈন্যদের খুব অসুবিধা হতে লাগলো। এই সুযোগে আফগান শূরেরা সক্রিয়ভাবে মোগলদের বিরোধিতা করতে শুরু করলো। তখন আকবর গৌড়বঙ্গের সুবাদার করে পাঠালেন হোসেন কুলিবেগকে। সঙ্গে এলেন আকবরের ভূমিরাজস্ব মন্ত্রী টোডরমল্ল। হোসেন কুলিবেগ ছিলেন সিয়া সম্প্রদায়ের মুসলমান। কিন্তু এতদিন যারা গৌড়বঙ্গ শাসন করতেন তাঁরা ছিলেন সুন্নি। অধিকাংশ রাজকর্মচারীই হোসেন কুলিবেগের প্রভুত্ব মেনে নিলেন না। টোডরমল্ল তীক্ষ্ণ ধীশক্তির পরিচয় দিয়ে সমস্ত বিবাদ-বিসংবাদ মিটিয়ে ফেলেন। হোসেন কুলি খান-ই জাহান উপাধি নিয়েছিলেন। ১৫৭৮ খ্রীস্টাব্দে তিনি মারা যান।

ষোড়শ শতকের শেষ দশকে টাঁড়ায় শাসনকর্তা হয়ে এলেন আকবরের বিখ্যাত রাজপুত সেনাপতি মানসিংহ। ১৬৯৫ খ্রীস্টাব্দে তিনি রাজধানী টাঁড়া থেকে নিয়ে গেলেন বিহারের রাজমহলে, বাজমহলের নতুন নাম হলো আকবর নগর। গৌড়ের গুরুত্ব ক্রমে কমতে শুরু করলো। স্বাধীন বাংলার স্বাধীন রাজধানী হিসেবে গৌড়-লখনৌতি, পাণ্ডুয়া ও টাঁড়া একসময় চরম গুরুত্ব পেয়েছিল। ফলে এখনও মালদা জেলার ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম। আজও মালদার বিভিন্ন প্রান্তে স্বাধীন সুলতানদের আমলের অসংখ্য নিদর্শন ছড়িয়ে রয়েছে।

বাংলাদেশে মোগল আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর মালদায় আর বিশেষ কোন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেনি। ১৬৪০ খ্রীস্টাব্দে যখন সুজা বাংলার শাসনকর্তা, তখন Manrique নামে জনৈক বিদেশী পর্যটক গৌড়ে এসেছিলেন। তিনি গৌড়কে একটি জঙ্গলাকীর্ণ পরিত্যক্ত নগরী হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

অষ্টাদশ শতকের গোড়ার দিকে মুর্শিদকুলি খাঁ বাংলার স্বাধীন নবাব হিসেবে রাজত্ব করতে শুরু করলেন। মুর্শিদকুলির পর বাংলায় রাজত্ব করেন সুজাউদ্দিন, সরফরাজ খাঁ, আলিবর্দী খাঁ ও সিরাজ-উদ্ দৌল্লা। এদের সময় মালদার বিশেষ কোন গুরুত্ব ছিলো না। তখন বাংলার রাজধানী ছিল বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলা।

আধুনিক যুগ : অষ্টাদশ শতকের গোড়ার দিক থেকেই মোগল সাম্রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়েছিল। বিভিন্ন স্থানীয় শক্তি কেন্দ্রীয় সরকারের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে নানাভাবে সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি মোগল সাম্রাজ্যের পতন ঘটলো। সারা ভারতবর্ষে তখন এক রাজনৈতিক শূন্যতা। এর সুযোগ নিল এক বিদেশী শক্তি—ইংরেজ। জাহাঙ্গীর যখন মোগল সম্রাট তখন স্যার টমাস রো'র নেতৃত্বে একদল ইংরেজ ভারতবর্ষে এসেছিল ব্যবসা করতে। মোগল সম্রাটদের দোর্দণ্ডপ্রতাপের যুগে এরা নিরীহ ব্যবসায়ী ছাড়া অন্য কিছু হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে চায়নি। কিন্তু মোগল সাম্রাজ্যের পতনেব পর ভারতবর্ষের দুর্বলতার সুযোগ নিতে এরা দেরি করেনি। ইংরেজ শক্তি ভারতবর্ষে তাদের আধিপত্য স্থাপন করতে প্রয়াসী হলো। আর বাংলা বিজয়ের মধ্য দিয়েই তাদের গোটা ভারতবর্ষ দখলের অভিযান আরম্ভ হয়েছিল।

এর পেছনে কারণ ছিল অন্য। কেবল নতুন দেশ দখলের নেশাতেই ইংরেজরা ভারতবর্ষ দখল করেনি। তাদের নিজের দেশ ইংলণ্ডের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্যই ভারতে তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন ছিল। মনে রাখতে হবে যুগটা ছিল শিল্প বিপ্লবের যুগ। যুগ যুগ ধরে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে সুবিধাজনক শর্তে বাণিজ্যের মাধ্যমে সংগৃহীত প্রচুর মূলধন, কারিগরি বিদ্যার ক্ষেত্রে উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিয়ে যন্ত্রের নিত্য নতুন আবিষ্কার এবং সস্তা শ্রমিক ইংলণ্ডে বৃহদায়তন শিল্প গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিল। এই শিল্পাশ্রয়ী সভ্যতাকে আরও শক্তিশালী করার জন্য এবং শিল্প বিপ্লবের গতি অব্যাহত রাখার জন্য ইংলণ্ডের প্রয়োজন ছিল তৈরি বাজারের। তাই পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে উপনিবেশ গড়ে তুলতে উৎসাহী হলো ইংলণ্ড। তাই মোগল সাম্রাজ্যের পতনের পর ভারতবর্ষের নৈরাজ্যের সুযোগ নিয়ে ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া

কোম্পানি এখানে তাদের রাজনৈতিক শক্তি প্রতিষ্ঠিত করতে উদ্যোগী হলো। রাজনৈতিক ক্ষমতা হাতে থাকলে অর্থনৈতিক শোষণ চালানো সুবিধা। শিল্প গড়ে তুলতে সহায়ক কাঁচামাল সুলভে ইংলণ্ডে পাঠানো যাবে, উপরন্তু সামনে খোলা থাকবে ভারতবর্ষের সুবিশাল বাজার।

১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দে বাংলার নবাব সিরাজ-উদ্-দৌল্লাকে পলাশীর যুদ্ধে পরাস্ত করলো ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি। ১৭৬৪ খ্রীস্টাব্দে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব মিরকাশিম বক্সারের যুদ্ধে পরাজিত হলেন ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির হাতে। বাংলাদেশ ইংরেজদের উপনিবেশে পরিণত হলো। এই ঔপনিবেশিক শাসনের প্রতিষ্ঠাকালকেই ভারতবর্ষের ইতিহাসের আধুনিক যুগের সূচনা হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। ভারতের ইতিহাস আধুনিক যুগে পা ফেলার সঙ্গে সঙ্গে মালদা জেলার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনেও আসতে শুরু করলো নতুন ধাচের ঘটনা।

মালদা জেলা গঠনের প্রশাসনিক ইতিহাস আগেই আলোচিত হয়েছে। তাই মালদার আধুনিক ইতিহাস আলোচনা করতে গিয়ে আমরা জেলার মানুষের ব্রিটিশবিরোধী লড়াইয়ের ঘটনাগুলোকে অধিক গুরুত্ব সহকারে আলোচনা করব।

ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলের মত, মালদা জেলার স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসকে আমরা দুটি ভিন্ন স্তরে বিভক্ত করতে পারি। একটি স্তরে স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ নিয়েছিলেন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী—যাদের নেতৃত্বে কখনও ছিল অনুশীলন সমিতি, ব্রতী সমিতি বা যুগান্তরের মত সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলো, আবার কখনও বা ভারতের জাতীয় কংগ্রেস। আর দ্বিতীয় স্তরে সংগ্রামে লিপ্ত ছিলেন জেলার দরিদ্র কৃষকেরা, যদিও কখনোই বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের মত মালদা জেলার কৃষক বিদ্রোহ ততটা জঙ্গীরূপ নেয়নি।

মালদা জেলার মানুষের ব্রিটিশবিরোধী মনোভাবের প্রথম তথ্য আমরা পাই Andrew Brown এর চিঠিপত্র থেকে। Brown উনিশ শতকের প্রথম দিকে মালদায় অনেকগুলি নীলকুঠির মালিক ছিলেন। তাঁর চিঠিপত্র থেকে জানা যায় যে উনিশ শতকের প্রথম দশকে গভর্নর জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলি মালদা ভ্রমণের পরিকল্পনা করেছিলেন। কিন্তু

এই ঘটনা জানার সঙ্গে সঙ্গেই মালদার মানুষের মধ্যে ব্যাপক উত্তেজনা দেখা দেয়। উত্তেজনা এত তীব্র হয়েছিল যে ওয়েলেসলি তাঁর সফর বাতিল করতে বাধ্য হন।

মালদার মানুষের ব্রিটিশবিরোধী মনোভাবের স্ফুরণ ঘটেছিল বঙ্গভঙ্গের সময়। ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দে ভাইসরয় লর্ড কার্জন বাংলাদেশ দু ভাগে বিভক্ত করেন এবং Eastern Bengal and Assam নামে একটি নতুন প্রদেশ তৈরি করার কথা ঘোষণা করেন। বলা হয় যে নতুন প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হবে আসাম, ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম, ঢাকা ও মালদা সহ রাজশাহী বিভাগের যাবতীয় জেলা। এই বিভাজনের সমর্থনে কার্জনের বক্তব্য ছিল—বাংলাদেশকে কিঞ্চিৎ ভারমুক্ত করা এবং আসামের উন্নয়ন সাধন কিন্তু তাঁর প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে দুর্বল করার জন্য হিন্দু ও মুসলমান এই দুই সম্প্রদায়ের মানুষকে পৃথক করে রাখা। বাংলার মানুষ কার্জনের এই অশুভ উদ্দেশ্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী আন্দোলন গড়ে তুললো। এই আন্দোলন মালদাকেও স্পর্শ করেছিল।

১৯০৫ খ্রীস্টাব্দে Sir Andrew Fraser (তৎকালীন লেফটেন্যান্ট গভর্নর) মালদায় এসে বঙ্গভঙ্গের সুফল ব্যাখ্যা করে একটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। কিন্তু বিশেষ লাভ হয়নি। সেই সময়েই মালদার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মালদার ছাত্রদের কোন রকম সরকারবিরোধী আন্দোলনে যোগ না দেওয়ার জন্য একটি পরোয়ানা জারি করেছিলেন। তা সত্ত্বেও জেলার যুব ছাত্ররা বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনে যোগদান করেছিল। সরকারি নথিপত্রে নুর বক্স নামে একজনের কথা জানা যায়, যিনি অনেকগুলো বঙ্গভঙ্গবিরোধী সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন। বিপিন পাল প্রমুখ নেতারা আন্দোলনের যে কর্মসূচী গ্রহণ করেছিলেন সেগুলোকে সমর্থন করার জন্য এ ধরনের সভার আয়োজন করা হতো। অধ্যাপক সুমিত সরকারের 'The Swadeshi Movement in Bengal' নামে বই থেকে জানা যায় যে এই সময়ে মালদা জেলায় স্বদেশীদের উদ্যোগে একটি জাতীয় স্কুল তৈরি হয়েছিল। এই স্কুলে সরাসরি রাজনীতি শিক্ষা দেওয়া হতো। ১৯০৭ খ্রীস্টাব্দের জুন মাসে অর্থনীতিবিদ বিনয় সরকার, মালদা পৌরসভার তৎকালীন সভাপতি বিপিনবিহারী ঘোষ এবং নুর বক্সের প্রচেষ্টায় মালদা জাতীয় শিক্ষা

সমিতি গড়ে উঠেছিল। এই জাতীয় শিক্ষা সমিতির অধীনে গড়ে উঠেছিল মালদা জাতীয় আদর্শ বিদ্যালয়। এই বিদ্যালয়ে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হতো। এর ছাত্রসংখ্যা ছিল ৯২। ১৯০৮ খ্রীস্টাব্দেব জুন মাসের মধ্যে জেলায় আটটি জাতীয় বিদ্যালয় গড়ে উঠেছিল। তাব মধ্যে তিনটি ছিল প্রাথমিক। আটটি বিদ্যালয়ে মোট ছাত্র সংখ্যা ছিল ৭৪৮ জন। মালদা জেলা জাতীয় শিক্ষা সমিতি কোলকাতার শিক্ষা সমিতিকে অন্ধভাবে অনুকবণ না করে, এক নতুন ধবনের শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চেষ্টা করেছিল। মালদাব শিক্ষা সমিতির উদ্যোক্তাবা ছাত্রদেব দিয়ে জেলাব পুবনো গ থা, লোক সঙ্গী ত প্রভৃ তি সংগ্রহ কবিয়ে তাদের জাতীয়তাবাদী প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন

এই সময়েই মালদা জেলায় অনুশীলন সমি ত ও ব্রতী সমিতির শাখা খোলা হয়েছিল। অনুশীলন সমিতিব মালদা জেলা শাখা তৈরিব ব্যাপারে উদ্যোগ নিয়েছিলেন মহেন্দ্র দে, দক্ষিণা লাহিড়ী এবং কংসগোপাল আগরওয়ালা। স্বদেশ পাকডাশী নামে এক ব্যক্তি রাজাবাজার বোমা মামলায় অভিযুক্ত হন। পুলিশের হাত থেকে পালিয়ে তিনি মালদা জেলায় আশ্রয় নেন ও সেখানে ব্রিটিশবিরোধী কাজকর্মে লিপ্ত হন। মালদা জাতীয় বিদ্যালয়ের অনেক ছাত্র এই স্বদেশ পাকড়াশীর অনুপ্রেরণায় সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে যোগদান করেছিলেন। আলিপুব বোমা মামলায় ধরা পড়েছিলেন মালদার এক ছাত্র কৃষ্ণজীবন সান্যাল। ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দে মালদা জেলা স্কুলেব প্রধান শিক্ষক নবীনচন্দ্র বসু সন্ত্রাসবাদীদেব হাতে নিহত হন। তাঁব বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল যে তিনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সহযোগিতা করতেন।

১৯১৯-২০ খ্রীস্টাব্দেব খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন মালদা জেলায় সেরকম কোন প্রভাব ফেলতে পাবেনি।

১৯২২ খ্রীস্টাব্দে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের কর্মসূচী গ্রহণেব ব্যাপারে নেতৃত্বেব মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিয়েছিল। একপক্ষে ছিলেন গান্ধিজী, রাজাগোপালাচারি, আনসারি, বল্লভভাই প্যাটেল প্রমুখ। বিপরীত পক্ষ গ্রহণ করেছিলেন মতিলাল নেহরু, চিত্তরঞ্জন দাশ, বিঠলভাই প্যাটেল প্রভৃতি। গান্ধিজীর অনুগামীদের বলা হতো নো-চেঞ্জার এবং বিরোধীদের বলা হতো প্রো-চেঞ্জার। কংগ্রেসের এই আভ্যন্তরীণ

মতানৈক্যর ঢেউ মালদা জেলাকেও স্পর্শ করেছিল। নো-চেঞ্জারদের তরফ থেকে সরোজিনী নাইডু মালদায় এসে বক্তৃতা করেন। প্রো-চেঞ্জারদের হয়ে জেলায় এসেছিলেন চিত্তরঞ্জন দাশ।

১৯৩০ খ্রীস্টাব্দের গান্ধিজীর নেতৃত্বাধীন আইন অমান্য আন্দোলন মালদা জেলাকে প্রভাবিত করেনি।

ইতিমধ্যে ব্রিটিশ রাজের বিভেদ নীতির ফলে জেলায় সাম্প্রদায়িকতাব বীজ মাথা চারা দিয়ে উঠেছিল। এরই ফলশ্রুতি হিসেবে ত্রিশের দশকে মালদায় হিন্দু মহাসভা ও মুসলিম লিগ তৈরি হলো।

১৯৪২ খ্রীস্টাব্দে গান্ধিজীর নেতৃত্বে শুরু হয়েছিল ঐতিহাসিক 'ভারত ছাড়' আন্দোলন। মালদা জেলায় এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন হরিশচন্দ্রপুরের গান্ধিবাদী নেতা সুবোধকুমার মিশ্র। তিনি ও তাঁব সহযোগী বিভূতি চক্রবর্তীর নেতৃত্বে আন্দোলনকারীরা জেলার বিভিন্ন অঞ্চলের রেললাইন ও টেলিগ্রাফের তার বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিলেন। তাঁরা বেশ কিছু ডাকঘর এবং রেলস্টেশনেও অগ্নিসংযোগ করেছিলেন। ১৯৪২ খ্রীস্টাব্দের ৪ঠা সেপ্টেম্বর পুলিশ সুবোধ মিশ্রকে গ্রেপ্তার করে। কিন্তু এলাকার জনগণ এই গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন ও তাঁকে মুক্ত করেন। কিন্তু পরে সুবোধবাবু আবার গ্রেপ্তার হন এবং রাজ-দ্রোহীতার অভিযোগে ৬½ বছরের জন্য সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন।

এবার আমরা আলোচনা করব জেলার সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্র বিরোধী কৃষক সংগ্রামের কথা। মালদায় প্রথম কৃষক বিদ্রোহ হয়েছিল ফকির ও সন্ন্যাসী বিদ্রোহের সময়। ফকির ও সন্ন্যাসী বিদ্রোহ শুরু হয়েছিল ১৭৬৩ খ্রীস্টাব্দে, ঢাকার একটি ইংরেজ কুঠি আক্রমণের মধ্য দিয়ে। এই বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়েছিল রংপুর, পাবনা, ময়মনসিংহ, রাজশাহী, দিনাজপুর ও মালদা জেলায়। হিন্দু সন্ন্যাসী ও মুসলমান ফকিররা ব্রিটিশ শোষণের বিরুদ্ধে দরিদ্র কৃষক ও ছোট কারিগরদের সংঘবদ্ধ করেছিলেন। ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ও ইংরেজ বণিকদের দ্বারা সৃষ্ট 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' এই বিদ্রোহের তীব্রতা বাড়িয়ে দিয়েছিল। মোগল শাসনের শেষ দিকে সন্ন্যাসী ও ফকিরেরা বিভিন্ন জায়গায় জমি-জমা দখল করেছিলেন বা সরকারি অনুদান হিসেবে জমি পেয়েছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে তাঁরা এই জমিগুলোতে বসতি স্থাপন করে

কৃষকের জীবন যাপন করতেন। মালদা জেলায় পাণ্ডুয়াতে ছিল ফকিরদের বাইশহাজারী এস্টেট। এই এস্টেটের অধীনে ছিল আদিনা মসজিদ ও বড়া দরগাহ্। 'মাদারী' ও 'বুরহান' এই গোষ্ঠীর ফকিররা মালদা জেলায় বাস করতেন।

মজনু শাহ্, মুসা শাহ্, চেরাগ আলী প্রভৃতির নেতৃত্বে ফকির বিদ্রোহ রংপুর, ময়মনসিংহ, বগুড়া প্রভৃতি জেলায় যতটা তীব্র রূপ নিয়েছিল, মালদায় এই বিদ্রোহের তীব্রতা সেই পর্যায়ে ওঠেনি। তবে বগুড়া জেলার মঞ্জুরা গ্রামে ইংরেজ সেনার সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহের শ্রেষ্ঠ নেতা মজনু শাহ্ গুরুতরভাবে আহত হন। তখন মজনুর শিষ্যরা আহত মজনুকে নিয়ে মালদার পাণ্ডুয়াতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এর থেকে অনুমান করা যায় যে ফকির বিদ্রোহী-দের একটা সংগঠন মালদা জেলায় ছিল। এরপর আহত মজনু বিহারে চলে যান। বিহারের মাখনপুর গ্রামে মজনু শাহ্র মৃত্যু হয়।

তৎকালীন গভর্নর জেনারেল হেস্টিংস এই বিদ্রোহকে 'হিন্দুস্থানের বর্বরদের পেশাদারী উপদ্রব' বলে ব্যাখ্যা করেছিলেন। হেস্টিংস এই গণসংগ্রামকে যে চোখে দেখুন না কেন, এই বিদ্রোহ মালদা তথা বাংলার মানুষের ব্রিটিশবিরোধী সংগ্রামের ইতিহাসে এক গৌরবময় স্থান অধিকার করে রয়েছে।

১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দে তদানীন্তন গভর্নর জেনারেল লর্ড কর্ণওয়ালিশ ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বুনিয়াদকে সুদৃঢ় করার জন্য বাংলাদেশে 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' বা Permanent Settlement প্রবর্তন করেন। ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ইংলণ্ডের Board of Directors বা পরিচালকমণ্ডলীর অনুমতিক্রমে বাংলাদেশের জমির ওপর নিজ অধিকার ত্যাগ করলো। জমির অধিকার ন্যস্ত করা হলো রাজস্ব আদায়কারী নতুন জমিদার শ্রেণীর হাতে। সমগ্র বাংলাদেশের ভূমি রাজস্ব নির্ধারিত হলো—২ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকা। বলা হলো, জমি গ্রহণের ঠিক এক বৎসর পরে জমিদারেরা নির্ধারিত রাজস্ব কোম্পানির হাতে তুলে দেবে। কৃষকদের কাছ থেকে যথেচ্ছভাবে খাজনা আদায়ের অধিকার পেল জমিদার শ্রেণী। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমিদারেরা চিরস্থায়ীভাবে জমির মালিকানা লাভ করলো। আর রাজস্বের হার চিরস্থায়ী করা

হলো, অথচ বলা হলো খাজনার হার হবে পরিবর্তনযোগ্য। অর্থাৎ কৃষকদের দেওয়া খাজনা বাড়ানোর ঢালাও স্বাধীনতা পেল এই নতুন জমিদার শ্রেণী। এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কার্যকরী করার পেছনে কর্নওয়ালিশের উদ্দেশ্য ছিল দুটি—এক, রাজস্ব বৃদ্ধি করা। দুই, কর্ণওয়ালিশ বুঝেছিলেন যে ভারতবর্ষে ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থা বহাল রাখতে হলে ইংরেজের কিছু বন্ধু দরকার। এই নবসৃষ্ট জমিদারশ্রেণীকে ব্রিটিশের বন্ধুতে পরিণত করতে চেয়েছিলেন কর্ণওয়ালিশ। যখনই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিপদে পড়েছিল, তখনই এই জমিদারেরা নিস্কুণ্ঠায় ব্রিটিশ রাজের প্রতি আনুগত্য দেখিয়েছিল। সাম্রাজ্যবাদের সহযোগী একটি শ্রেণী হিসাবে পরিচিত হয়েছিল তারা।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর জমিদার শ্রেণী কৃষকদের থেকে নির্বিচারে কর আদায় করতে লাগলো। কৃষকেরা এই অত্যাচারের উত্তর দিয়েছিল বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে। গোটা উনিশ শতক ধরে বাংলাদেশে চলেছিল কৃষকদের সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্র বিরোধী নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম। কিন্তু মালদা জেলা কখনোই কৃষক বিদ্রোহের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান হিসেবে প্রতিভাত হয়নি।

১৮৫৫ খ্রীস্টাব্দে সাঁওতাল বিদ্রোহের সময় মালদা জেলা ছিল উত্তেজনারহিত একটি এলাকা। Hunter এর লেখা থেকে জানা যায় যে সাঁওতালদের প্রতিরোধ আন্দোলন ভেঙে পড়ার পর কোম্পানির সৈন্যদের অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচার জন্য সাঁওতালরা বাংলার পুরুলিয়া ও বীরভূম থেকে ও বিহারের সাঁওতাল পরগনা থেকে দলে দলে চলে এসেছিল মালদায়। মালদার উর্বর বরিন্দ অঞ্চলে তারা তাদের নতুন বসতি গড়ে তুলেছিল।

১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের মহাবিদ্রোহ মালদা জেলায় কোন প্রভাব ফেলেনি। ১৮৬০ খ্রীস্টাব্দের নীলবিদ্রোহের সময়েও মালদা ছিল অপেক্ষাকৃত শান্ত। নদীয়া, কুষ্টিয়া, খুলনা, যশোহর প্রভৃতি জেলায় নীলচাষীরা যখন নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল, সেই সময় মালদা জেলার বাক্রাবাদে ইংরেজদের একটিমাত্র নীলকুঠি আক্রান্ত হয়েছিল।

১৯২৪ খ্রীস্টাব্দে মালদা জেলার খরবাতে একটি কৃষক আন্দোলন হয়েছিল। সে বছর ফসল ভাল হয়নি। দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি দরিদ্র কৃষকদের

অবস্থা অসহনীয় করে তুলেছিল। তার মধ্যে ছিল জমিদারের কর আদায়ের চাপ। তখন খরবার কৃষকরা চাঁচোলের জমিদারের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেছিল। সহজেই এই আন্দোলন দমন করা হয়েছিল।

১৯৩২ খ্রীস্টাব্দে মালদায় একটি সাঁওতাল বিদ্রোহ হয়েছিল। ১৮৫৫ খ্রীস্টাব্দে সাঁওতাল বিদ্রোহ যখন সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রের আক্রমণের মুখে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল, তখন প্রচু সাঁওতাল আত্মরক্ষার তাগিদে মালদায় এসে বসতি স্থাপন করেছিল। সাঁওতালরা মালদায় বসতি স্থাপন করার সঙ্গে সঙ্গেই জমিদারি শোষণের শিকার হলো। জমিদারেরা সাঁওতাল চাষীদের জমি বর্গা দিতে শুরু কবলো। বর্গাদাব সাঁওতালরা নিজেদের খরচে ফসল ফলাতো। উৎপাদিত ফসলের অর্ধেকটা দিতে হতো জমিদারকে। ফসলের অর্ধেক দিতে হতো বলে এই বর্গাদারদের আধিয়ার বলা হতো। অনেকদিন ধরে কোনো আধিয়ার জমি চাষ করলে, জমির ওপর তার অধিকার জন্মাতে পারে এই ভয়ে জমিদাররা প্রায়ই আধিয়ার-দের জমি থেকে উৎখাত করতো তার বদলে নতুন লোক দিয়ে জমি চাষ করাতো। সাঁওতালরা জমিদারের দ্বিমুখী শোষণের শিকার হলো। এক, খাজনার শিকার আর তুই, উচ্ছেদের শিকার।

১৯৩২ খ্রীস্টাব্দে মালদা জেলাব কোতয়ালির জমিদার সাঁওতাল বর্গাদারদের থেকে তুই-তৃতীয়াংশ ফসল দাবি করলো। বর্গাদারদের এই সঙ্কটের সুযোগ নিতে এগিয়ে এলো গ্রামীণ মহাজনরা। নিজের খরচে ফসল ফলাতে হতো বলে বর্গাদাররা প্রায়ই চড়া সুদে ঋণ নিত মহাজনদের কাছ থেকে। জমিদারের খাজনার হার বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই গ্রামীণ মহাজনরাও সুদের হার বাড়িয়ে দিল। সাঁওতাল চাষীরা বর্ধিত খাজনা দিতে রাজি হলো না। তাদের জমি থেকে উচ্ছেদ করে নতুন বর্গাদার বসিয়ে তাদের মধ্যে জমি বিলি করা হলো। সাঁওতাল চাষীরা এবার সংগঠিত হতে শুরু করলো। দিনাজপুর জেলার বাঁশরি গ্রামে তারা সমবেত হয়ে জমিদারি অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করার শপথ নিল। সাঁওতালদের নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে এসেছিলেন জিতু বোটকা।

ইতিমধ্যে একটি ছোট ঘটনা ঘটলো। সাঁওতালরা আদিনা মসজিদের কাছাকাছি কোন জায়গায় কালীপুজোর আয়োজন করেছিল। কিন্তু তৎ-কালীন জেলা শাসক কোন কারণ না দেখিয়ে পূজো বন্ধ করার হুকুম

দিলেন। এই হুকুম অগ্রাহ্য করে সাঁওতালরা কালীপুজো সম্পন্ন করলো। তখন পুলিশ জিতুর সহযোগী অর্জুন সাঁওতালকে গ্রেপ্তার করলো। জিতুর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারি করা হলো। এতে সাঁওতালদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল। জমিদারের অত্যাচারক্লিষ্ট সাঁওতালদের প্রচ্ছন্ন বিক্ষোভ এতদিনে বেরোবার পথ পেল। জিতু ও সাঘুর নেতৃত্বে সাঁওতালরা কোতয়ালির জমিদারের বাড়ি ও ধানের গোলা লুঠ করলো। গ্রামীণ মহাজনদের সম্পত্তিও আক্রান্ত হলো। দিনাজপুর ও মালদা জেলার এক ব্যাপক অঞ্চল জুড়ে সাঁওতাল বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়লো।

এই বিদ্রোহ দমন করার জন্য দলে দলে পুলিশ বাহিনী ছুটে এলো। তীর ধনুক আর বল্লম-তলোয়াল নিয়ে বেশিদিন গোলা বারুদের মোকাবিলা করা সম্ভব হলো না। এই অসমান যুদ্ধ চালানোর জন্য চাই দুর্গের মত একটা আশ্রয়—যেখান থেকে তারা দূরপাল্লার তীর ছুড়বে আব পুলিশের গুলির হাত থেকে আত্মরক্ষা করবে। সিদ্ধান্ত হলো পাণ্ডুয়ার ঐতিহাসিক আদিনা মসজিদকে সাঁওতালরা দুর্গ হিসাবে ব্যবহাব করবে। জিতু দেওয়ালের আড়াল থেকে শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ চালাবার এক অভিনব পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন।

জিতু ও সাঘু প্রায় দু'হাজার সাঁওতাল যুবক দিয়ে গড়া বাহিনী নিয়ে গোপনে আদিনা মসজিদে আশ্রয় নিলেন। বাহিনীকে কতগুলো ভাগে ভাগ করা হলো। এক একটি ভাগ এক এক স্থানে জায়গা নিল। সাঁওতালদের প্রধান সেনাপতি হলেন জিতু। তিনি নিজেকে 'সেনাপতি গান্ধি' বলে ঘোষণা করলেন।

সে সময় সারা ভারতবর্ষ জুড়ে গান্ধির নেতৃত্বে চলেছিল আইন অমান্য আন্দোলন। প্রত্যেক সাধারণ মানুষের কাছে গান্ধির নাম ছড়িয়ে পড়েছিল। মালদার সাঁওতাল ভাগচাষীরা জানতো না গান্ধি কে, কি তার উদ্দেশ্য অথবা নীতি। তারা শুধু এটুকু জানতো যে গান্ধি নামে এক ব্যক্তি সাধারণ মানুষের শত্রু ব্রিটিশের সঙ্গে সংগ্রাম চালাচ্ছেন। সাঁওতালদের কাছে গান্ধির নাম সংগ্রামের প্রতীক, প্রেরণার উৎস। তাই জিতু সাঁওতাল 'সেনাপতি গান্ধি' নাম নিয়ে ব্রিটিশ ও তাঁর সহযোগী জমিদারের বিরুদ্ধে লড়াই করার প্রস্তুতি নিয়েছিলেন।

বিদ্রোহী সাঁওতালদের আদিনা মসজিদে প্রবেশের সংবাদ পেয়ে সশস্ত্র

পুলিশ বাহিনী এগিয়ে এলো । তাদের সহযোগিতা করলো মালদা দিনাজপুরের জমিদার-মহাজনের দল । ১৯৩২ খ্রীস্টাব্দের ১৪ই নভেম্বর (মতান্তরে ১৪ই ডিসেম্বর) পুলিশ বাহিনী আদিনা মসজিদ ঘিরে ফেললো। জেলা শাসক সাঁওতালদের আত্মসমর্পণ করতে নির্দেশ দিলেন। মসজিদের ভেতর থেকে এক ঝাঁক তীরের মধ্য দিয়ে উত্তর এলো। শুরু হলো পুলিশের গুলিবর্ষণ। সাঁওতালদের পাল্টা আক্রমণ বহু পুলিশকে ধরাশায়ী করলো। বহুক্ষণ লড়াই চালানোর পর সাঁওতালদের শক্তি ফুরিয়ে এলো। তখন পুলিশ মসজিদের ভিতরে প্রবেশ করে বহু সাঁওতালকে হত্যা করলো। জিতু ও তার সহকারী সাঘুও তাদের সঙ্গীদের সঙ্গে বীরের মৃত্যু বরণ করলো । জিতু সাঁওতালের মৃত্যু পুলিসের হয়নি । জিতুর মৃত্যু হয়েছিল কোতয়ালির জমিদারের গুলিতে । বিদ্রোহের নেতাকে মারার পুরস্কার হিসেবে কোতয়ালির জমিদার খান চৌধুরী উপাধি পেয়েছিলেন ।

অনেকে সাঁওতালদের এই সংগ্রামকে নিছক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হিসাবে দেখাতে চেয়েছেন। তাঁরা সাঁওতালদের এই গৌরবময় সংগ্রামের গুরুত্বকে খাটো করে বলতে চেয়েছেন আদৌ কোন অর্থনৈতিক বা সামাজিক সঙ্কট সাঁওতালদের বিক্ষুব্ধ করেনি। গোটা ব্যাপারটাই ছিল হিন্দু সাঁওতালদের কালীপুজো সংক্রান্ত ঝামেলা । হিন্দু সাঁওতালরা আদিনা মসজিদে আশ্রয় নিয়ে মুসলমানদের বিরাগভাজন হয়েছিল—এ রকম কথাও কেউ কেউ বলে থাকেন। কথাগুলো আদৌ সত্য নয়। সাঁওতালরা কখনোই দরিদ্র মুসলমানদের বিরাগভাজন হয়নি । গণসংগ্রাম গড়ে তোলার জন্য তাঁরা বিরাগভাজন হয়েছিল হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ভুক্ত জমিদারদের এবং তাদের সৃষ্টিকারি পৃষ্ঠপোষক ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের।

মালদার সাঁওতাল বিদ্রোহ দমন করা হলো। কিন্তু আদিনা মসজিদ আজও সেই গণসংগ্রামের নীরব সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পুলিশের গুলিবর্ষণের চিহ্ন আজও আদিনার গায়ে সুস্পষ্ট গুলিবর্ষণের চিহ্নগুলো জিতু ও তাঁর সঙ্গীদের সাহসের পরিচয় বহন করে রেখেছে।

ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টির শাখা মালদায় খোলা হয়েছিল ত্রিশ দশকের মাঝামাঝি সময়ে। ১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দের ৪ঠা মে সারা ভারত কৃষক সভার প্রাদেশিক সম্মেলনের তৃতীয় অধিবেশন আরম্ভ হয় মালদা জেলার নবরিয়া

গ্রামে ৪, ৫ ও ৬ মে ধরে অধিবেশন চলে।

সম্মেলন উপলক্ষে প্রচারের জন্য কৃষকসভার অন্যতম নেতা সুজাত আলি মজুমদারকে কলকাতা থেকে মালদায় পাঠানো হয়েছিল। সেই সময় চাঁচোলের জমিদার প্রজাদের থেকে বাকি খাজনা আদায় করার জন্য পীড়ন চালাচ্ছিলেন। সুজাত আলির নেতৃত্বে জেলার কৃষকেরা বাকি খাজনা মকুব করার জন্য আন্দোলন শুরু করলেন। ১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসে মালদা শহরে প্রায় আট হাজার কৃষকের একটি বিরাট মিছিল বের হয়। কৃষকেরা জেলা শাসকের কাছে তাদের দাবি-দাওয়ার কথা জানান। সরকারি কর্তৃপক্ষ কৃষকদের এই দাবিগুলোর প্রতি আর নির্লিপ্ত দৃষ্টি নিয়ে বসে থাকতে পারলেন না। জেলাশাসক চাঁচোলের জমিদারকে বাকি খাজনা মাফ করতে অনুরোধ জানান। অবস্থার গুরুত্ব বুঝে জমিদার এই অনুরোধ মেনে নিয়েছিলেন। এই ঘটনা চাঁচোলের কৃষকদের যেমন স্বস্তি দিয়েছিল তেমনই সারা মালদা জেলার কৃষকদের উৎফুল্ল করেছিল। কৃষক সভার কার্যকলাপের উপর জেলার চাষীদের আস্থা অনেক বেড়ে গিয়েছিল। ফলে কৃষক সভার সম্মেলনে জেলার প্রচুর কৃষক যোগদান করেছিল।

চল্লিশের দশকের গোড়ায় উত্তরবঙ্গে হাটতোলা আন্দোলন শুরু হয়েছিল। হাটের ও মেলার জমিদার বা ইজারাদারেরা ব্যাপারিদের কাছ থেকে অত্যধিক হারে তোলা আদায় করতো। কৃষকেরা তাদের জমির তরিতরকারি বিক্রি করতে এলেই, এই তোলার শিকার হতো। জলপাইগুড়ি জেলার কৃষকেরা প্রথম তোলার হার কমানোর দাবিতে আন্দোলন আরম্ভ করে। পরে এই আন্দোলন রংপুর, দিনাজপুর ও মালদা জেলায় ছড়িয়ে পরে।

১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দে বাংলার বিভিন্ন জেলায় ঐতিহাসিক তেভাগা আন্দোলন আরম্ভ হয়। কৃষকেরা দাবি করে ফসল তিন ভাগ হবে—দু' ভাগ পাবে কৃষকেরা ও এক ভাগ পাবে জমিদার। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার কতকগুলো অঞ্চলের সঙ্গে উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি, রংপুর ও দিনাজপুর জেলায় এই আন্দোলন ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল। কিন্তু পাশের জেলা মালদাকে তেভাগার উত্তেজনা স্পর্শ করেনি বললেই চলে। চরুল বিলের কাছে চারজন আদিবাসী কৃষকের পুলিশের হাতে নিহত হওয়ার ঘটনা ছাড়া, তেভাগা আন্দোলন চলাকালীন কোনো উত্তেজনাপূর্ণ ঘটনা মালদায় ঘটেনি।

৯

শিক্ষা ও সংস্কৃতি

Buchanan Hamilton সাহেবের লেখা থেকে জানা যায় যে, মালদা জেলায় প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া হতো গ্রামীণ পাঠশালাগুলোতে। পাঠশালাব শিক্ষকদের বলা হতো গুরু। মালদা জেলায় প্রত্যেক গুরুর অধীনে কুড়ি জন মতো ছাত্র অধ্যয়ন করতো। এই গুরুরা সরকার থেকে কোনো আর্থিক সাহায্য পেতেন না। ছাত্রদের মাসিক মাহিনা দিয়ে তাঁরা জীবিকা নির্বাহ করতেন। ছাত্রদের মাসে চার আনা থেকে আট আনা করে মাহিনা দিতে হতো। তবে দূরবর্তী গ্রামাঞ্চলে ছাত্ররা আরো কম বেতন দিত। পাঠশালাগুলোতে কেবলমাত্র মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান করা হতো। পাঠশালার পাঠ সমাধা করে হিন্দু ছাত্ররা চতুষ্পাঠীতে যেত উচ্চশিক্ষা অর্জনের জন্য। এই চতুষ্পাঠীগুলোকে স্থানীয় লোকেরা চৌবেরি বলতো। চতুষ্পাঠীগুলো যিনি পরিচালনা করতেন, তাঁকে বলা হতো অধ্যাপকাশ। সাধারণত ব্রাহ্মণ সন্তানেরাই অধ্যাপকাশের দায়িত্ব পেতেন। অধ্যাপকাশেরা নিষ্কর জমি (revenue-free land) পেতেন। এই জমির আয় দিয়ে তাঁদের সংসাব চলতো। ছাত্রদের তাঁরা বিনা বেতনেই শিক্ষা দান করতেন। এই চতুষ্পাঠীগুলোতে সংস্কৃতের মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হতো। ছাত্ররা ব্যাকরণ, কাব্য এবং আইন সংক্রান্ত বিষয়ে জ্ঞান লাভ করতো।

মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত ছেলেরা প্রাথমিক শিক্ষার জন্য গুরুর কাছে পাঠশালায় পড়তে যেত। তারপর উচ্চশিক্ষার্থে তারা প্রবেশ করতো মক্তবে। মক্তবগুলো ছিল ফার্সি ভাষা শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। কিন্তু মালদা জেলার কোনো প্রতিষ্ঠানেই আরবি ভাষা শেখানোর কোনো ব্যবস্থা ছিল না।

যদিও মালদা জেলা ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসনাধীনে এসেছিল ১৭৬৫ খ্রীস্টাব্দে, তবুও Hamilton সাহেবের অনুল্লেখ প্রমাণ করে যে, ১৮১০ খ্রীস্টাব্দেও এ জেলায় ইংরেজি শিক্ষার কোনো প্রতিষ্ঠান তৈরি হয়নি। যতদূর জানা যায় যে মালদায় প্রথম ইংরেজি শিক্ষার স্কুল

স্থাপিত হয়েছিল ১৮৬০ খ্রীস্টাব্দে। একটি সরকারি রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে ১৮৭০ খ্রীস্টাব্দে মালদা জেলায় চারটি সরকার-নিয়ন্ত্রিত বিদ্যালয় ছিল। এর মধ্যে তিনটিতে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হতো, আর একটিতে ইংরেজি ভাষা শেখানো হতো। ১৮৭২ খ্রীব্দাব্দে Sir John Campbell নামে এক সাহেব মালদা জেলার প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বেশ কিছু পরিবর্তন সাধন করেন এবং প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থাকে উন্নততর রূপ দিতে প্রয়াসী হন। তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী জেলার পাঠশালার শিক্ষকদের জন্য শিক্ষণকেন্দ্র গড়ে তোলা হয়।

১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দে স্থাপিত হয় মালদা জেলা স্কুল। ১৮৬৩ খ্রীস্টাব্দে স্থাপিত হয়েছিল মালদা সদর ভার্নাকুলার স্কুল। ১৯০১ খ্রীস্টাব্দে মালদা সদর ভার্নাকুলার স্কুল জেলা স্কুলের সঙ্গে মিলিত হয়। তখন থেকেই মালদা সদর ভার্নাকুলার স্কুলের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব লোপ পায়। ১৯০০ খ্রীস্টাব্দে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ দীনবন্ধু চৌধুরী দুর্গাদেবী পাঠশালা গড়ে তুলেছিলেন। আজ এই পাঠশালাটির নাম দীনবন্ধু দুর্গাদেবী পাঠশালা।

বর্তমানে মালদা জেলায় প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ২৬৬। প্রায় সমস্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা সরকার থেকে বেতন পান। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে জেলা স্কুল বোর্ড।

মালদা জেলায় চারটি কলেজ আছে। মালদা কলেজ, চাঁচোল কলেজ, সামসী কলেজ ও মালদা মহিলা কলেজ। এগুলির মধ্যে মালদা কলেজ সব থেকে পুরনো (১৯৪৪ খ্রীস্টাব্দে স্থাপিত)। একমাত্র মালদা কলেজেই কলা, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য এই তিনটি বিষয়ই পড়ানো হয়। অন্য কলেজ-গুলিতে কেবলমাত্র কলা বিভাগ রয়েছে। মালদা, সামসী এবং চাঁচোল —এই তিনটি কলেজেই আরবি পড়ানো হয়। ফার্সি কোথাও পড়ানো হয় না।

মালদা কলেজ তৈরির পিছনে একটা মজার গল্প প্রচলিত আছে। মালদা কলেজ আগে যেখানে ছিল, এখন সে জায়গাটা বাংলাদেশের অন্তর্গত। কলেজের তৎকালীন আরবির অধ্যাপক সানাউল্লাহ্ সাহেব এবং দর্শনের অধ্যাপক শ্রী মণি দে সরকার মহানন্দার এপাড়ে অর্থাৎ ইংলিশ বাজারে কলেজটি নিয়ে আসবেন ঠিক করলেন। কিছু ছাত্রের সহযোগিতায় এই দুই অধ্যাপক রাতের অন্ধকারে একদিন কলেজের সমস্ত কাগজপত্র,

গ্রন্থাগারের যাবতীয় বই নিয়ে ইংলিশবাজারে এসে হাজির হলেন। পরদিনই কলেজ বসলো অতুল মার্কেটের কাছে। এই ঘটনাটি ঘটে ১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দে। মালদা কলেজ তার বর্তমান জায়গায় বসতে শুরু করে ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দ থেকে।

মালদা কলেজ ও মালদা মহিলা কলেজ ইংলিশবাজার থানায় অবস্থিত। সামসী কলেজ রতুয়া থানায় ও চাঁচোল কলেজ খরবা থানার অন্তর্গত। চাঁচোলের রাজবাড়িতে চাঁচোল কলেজের ক্লাস বসে।

মালদায় কোনো বিশ্ববিদ্যালয় নেই। তবে বেশ কিছু কারিগরি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এদের মধ্যে মালদা পলিটেক্‌নিক কলেজ সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এই কলেজে মেকানিক্‌স (বলবিদ্যা), সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং, ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়, ও উত্তীর্ণ ছাত্রদের উক্ত বিষয়গুলোতে ডিপ্লোমা দেওয়া হয়। এখান থেকে পাশ করে বেশ কিছু ছাত্র সরকারি, বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থায় চাকুরি পেয়েছে।

এছাড়া শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনে বেশ কিছু কারিগরি শিক্ষণ-কেন্দ্র মালদা জেলায় রয়েছে। এদের মধ্যে Industrial Training Institute এর নাম সর্বাগ্রে করতে হয়। এছাড়া হস্তবুনন শেখানোর জন্য রয়েছে মালদা শিল্প বিদ্যাপীঠ। এখানে দু বছরের পাঠ্যক্রম চালু আছে। এক বছরের পাঠ্যক্রম সংবলিত আরেকটি বুনন শিক্ষণ কেন্দ্র আছে—যার নাম Malda District Weaving School।

মালদা জেলায় একটি বি. এড. কলেজ আছে। প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য শিক্ষণ কেন্দ্র আছে। এ ছাড়া হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পিপলা অঞ্চলে রয়েছে Mothers' Training Centre। এখানেও প্রাথমিক শিক্ষকদের ট্রেনিং দেওয়া হয়। প্রবীন গান্ধীবাদী নেতা শ্রীসুবোধকুমার মিশ্রের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এই Training Centre গড়ে উঠেছে।

গ্রন্থাগার : মালদা জেলায় জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে কতগুলি জাতীয়তাবাদী ইস্কুল গড়ে উঠেছিল একথা আগেই বলা হয়েছে। তারই পাশে গড়ে উঠেছিল কতগুলি গ্রন্থাগার—জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে। গোলাপট্টির সরস্বতী লাইব্রেরি, কুতুব-

পুরের সারদা লাইব্রেরি, মক্দমপুরের বীণাপাণি লাইব্রেরি স্বাদেশিকতার আখরা হিসেবে প্রতিভাত হয়েছিল ব্রিটিশ সরকারের চোখে। তাই মাঝে মাঝেই সরকারের দমননীতির শিকার হতে হয়েছিল এই সব গ্রন্থাগার ও তার পরিচালকদের।

চাঁচোলের জমিদাররা একটি গ্রন্থাগার তৈরি করেছিলেন। এর বর্তমান নাম কুমার শিবপদ মেমোরিয়াল লাইব্রেরি। এই লাইব্রেরিতে এখনও প্রচুর মূল্যবান গ্রন্থ সংগৃহীত আছে। গুরুত্বপূর্ণ আরবি ও ফার্সি গ্রন্থের ইংরাজি অনুবাদও রয়েছে চাঁচোলের এই গ্রন্থাগারে। এই গ্রন্থগুলি নিঃসন্দেহে ভারতবর্ষের মধ্যযুগের ইতিহাসের মনোযোগী ছাত্রদের কাছে খুবই মূল্যবান। ঠিকমতো দেখাশোনার অভাবেই হোক বা যে কোনো কারণেই হোক, এই অমূল্য গ্রন্থগুলো প্রায় নষ্ট হতে বসেছে। চাঁচোলের খুব কাছেই কলিগ্রামে রয়েছে ভারতী-ভবন পাঠাগার।

জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করার জন্যই ১৯২৯-৩০ খ্রীস্টাব্দে গড়ে উঠেছিল হরিশ্চন্দ্রপুর বান্ধব পাঠাগার এবং পিপলা পল্লী সমিতি পাঠাগার। এই দুটি গ্রন্থাগার এখনও রয়েছে। যদিও হরিশ্চন্দ্রপুর বান্ধব পাঠাগারের নাম এখন হয়েছে দেশিকোত্তম বিধুশেখর শাস্ত্রী পুর-গ্রন্থাগার।

১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দে ইংলিশবাজারে প্রতিষ্ঠিত হয় বি. আর. সেন লাইব্রেরি। ১৯৫৮ খ্রীস্টাব্দে এই লাইব্রেরিটি মালদা জেলা লাইব্রেরিতে পরিণত হয়। ১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দে মালদা মুসলিম ইন্স্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়। একই সঙ্গে তৈরি হয় মুসলিম ইনস্টিটিউট লাইব্রেরি। জেলা লাইব্রেরি চলে সরকারি অনুদানে।

মালদা শহরে তিনটি গ্রন্থাগার রয়েছে—জেলা লাইব্রেরি, মুসলিম ইন্স্টিটিউট লাইব্রেরি এবং রামকৃষ্ণ মিশন লাইব্রেরি। অধুনা পশ্চিমবঙ্গ সরকার বেশ কিছু গ্রামীণ গ্রন্থাগার (Rural Library) গড়ে তুলতে প্রয়াসী হয়েছে। এখন মালদা জেলায় এ ধরনের গ্রামীণ গ্রন্থাগারের সংখ্যা আশির কাছাকাছি।

মালদা জেলা গ্রন্থাগারের সঙ্গেই গড়ে উঠেছিল মালদা মিউজিয়াম। ১৯৫৮ সালে মালদা মিউজিয়ামকে জেলা গ্রন্থাগারের থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়। এই মিউজিয়ামে বিভিন্ন পুরনো মূর্তি ও মুদ্রা সংগৃহীত রয়েছে।

হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি, বিভিন্ন ধরনের বৌদ্ধ মূর্তি রয়েছে এই মিউজিয়ামে। বিভিন্ন মূর্তির গায়ে তাদের নির্মাণের সময় লিপিবদ্ধ রয়েছে। তবে নির্মাণকাল লিপিবদ্ধ হয়েছে অনেক পরে, ফলে অনেকগুলো সালই লেখা হয়েছে অনুমানের উপর ভিত্তি করে।

মালদা জেলায় বেশ ক'টি পত্রিকা বার হয়। এদের অধিকাংশই সাপ্তাহিক বা পাক্ষিক। এগুলোর মধ্যে গৌড়দূত, মালদার খবর, মালদা সমাচার, গৌড়কণ্ঠ, গৌড়ভূমি, উদয়ন ইত্যাদি মোটামুটি জনপ্রিয়। এগুলির মধ্যে অনেকগুলো পত্রিকাই কোনো না কোনো রাজনৈতিক দলের কুক্ষিগত, যদিও সরাসরি কোথাও তা স্বীকৃত হয় না। উত্তরবঙ্গ সংবাদ নামে শিলিগুড়ি থেকে প্রকাশিত একটি দৈনিকে মালদা জেলা সম্পর্কে বেশ কিছু তথ্য পরিবেশিত হয়। অধুনা মালদা জেলায় 'রূপান্তরের পথে' নামে একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা বের হচ্ছে। এই পত্রিকায় জেলার সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা নিয়ে নতুন ধরনের প্রবন্ধ লেখার ব্যাপারে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

মালদা জেলার লোক সংস্কৃতির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো গম্ভীরা গান ও আলকাপ্ গান। বিশেষত গম্ভীরা গান মালদা জেলায় অত্যন্ত জনপ্রিয়। গম্ভীরা গানের বিশেষত্ব এই যে, এতে নাটক ও গান এই দুয়ের আস্বাদই পাওয়া যায়। সাধারণত কোনো স্থানীয় সমস্যা নিয়ে গায়করা (তাদেরই একজন গীতিকার) গান বাঁধে। তারপর সেই বিষয়ে তারা গাইতে থাকে। কখনও গদ্যের মাধ্যমেও তারা তাদের মনের ভাব ব্যক্ত করে। সমস্ত ব্যাপারটাতেই একটা স্যাটায়ার রয়েছে। অর্থাৎ যে স্থানীয় সমস্যা নিয়ে তারা গান বাঁধছে সে মস্করা জন্য যে বা যারা দায়ী তাদের রসিকতাপূর্ণ কটাক্ষ করা গম্ভীরা গানের একটি বৈশিষ্ট্য। নির্বাচনের সময় বিভিন্ন রাজনৈতিক দল গম্ভীরা গানের আয়োজন করে। গম্ভীরা গানের মধ্য দিয়ে কোনো রাজনৈতিক দল তার বিপক্ষ দলটিকে ব্যঙ্গ করে জনমত গঠনের চেষ্টা করে। আল্কাপ গানের ঢংও অনেকটা একই বকম। তবে আল্কাপ গানে অনেক সময় উপজীব্য বিষয় থাকে ইতিহাসের কোনো ঘটনা বা পৌরাণিক কোনো ঘটনা। মালদা জেলায় গম্ভীরা গানের দলগুলোর মধ্যে নীরুবাবুর দল, মটরবাবুর দল ও দোকড়ি-বাবুর দল বিখ্যাত।

বাংলা গদ্যের বিকাশের ক্ষেত্রে মালদা জেলার একটা বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। বামনগোলা থানার মদনাবতী গ্রামে ১৭৯৪ খ্রীস্টাব্দে নীলকুঠির চাকুরি নিয়ে এসেছিলেন বিখ্যাত উইলিয়াম কেরি। তাঁর মূল উদ্দেশ্য ছিল খ্রীস্টধর্ম প্রচার করা। সুদূর ভারতে ঔপনিবেশিক শাসন টিকিয়ে রাখতে হলে কেবল অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণই যথেষ্ট নয়—উপনিবেশের মানুষের সংস্কৃতির মধ্যেও অনুপ্রবেশের প্রয়োজনীয়তা আছে—একথা বুঝতে এতটুকু অসুবিধা হয়নি বিদেশী শাসকদের। সুতরাং খ্রীস্টধর্ম প্রচার করা এবং তার সঙ্গে বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনে অনুপ্রবেশ করে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের ভিত্তি দৃঢ় করার উদ্দেশ্য নিয়েই মালদা জেলায় এসেছিলেন উইলিয়াম কেরি। কেরি সাহেবের সঙ্গে মালদায় এসেছিলেন কেরি সাহেবের মুনসি রামরাম বসু। রামরাম বসুর কাছে কেরি সাহেব বাংলা শিখতেন। কেরি মদনাবতীতে একটি ইংরাজি স্কুল স্থাপন করেছিলেন। সেখানে বাংলাও শেখানো হতো। এই স্কুলে বিদেশী রীতিতে শিক্ষাদানের একটা প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন কেরি।

মালদা জেলার মদনাবতীতে বসেই বাংলা ভাষায় বাইবেল অনুবাদের কথা চিন্তা করেছিলেন উইলিয়াম কেরি। সংস্কৃতের নাগপাশ থেকে বার করে স্বচ্ছ বাংলা গদ্যের পরিকল্পনা তখনই কেরির মাথায় আসে। তিনি মদনাবতীতে একটি মুদ্রণযন্ত্রও আনিয়েছিলেন। কিন্তু নানা কারণে মালদার মদনাবতী ছেড়ে তাঁকে চলে যেতে হলো শ্রীরামপুরে। মুদ্রণযন্ত্রটিও তাঁর সঙ্গী হয়েছিল। কিন্তু মদনাবতীর স্মৃতি পুরোপুরি ছাড়তে পারেননি কেরি সাহেব। পরবর্তীকালে তাঁর বিভিন্ন লেখায় মালদার কথ্যভাষা স্থান পেয়েছিল।

মালদা জেলার সাংস্কৃতিক বিকাশের ক্ষেত্রে যে সব কৃতী সন্তানের যথেষ্ট অবদান রয়েছে তাঁদের মধ্যে আছেন বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ বিনয় সরকার, সংস্কৃত ও পালি সাহিত্যের সুপণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী, পণ্ডিত হরিদাস পালিত প্রভৃতি। চাঁচোলের রাজবাড়িতে বেশ কিছুদিন চাকুরি করে গেছেন বাংলা রসসাহিত্যের অন্যতম অগ্রদূত এবং বিখ্যাত প্রাবন্ধিক শিবরাম চক্রবর্তী। অধুনা প্রকাশিত, সুধীরকুমার চক্রবর্তী রচিত 'গৌড় পাণ্ডুয়ার ধারাস্নানে মালদহ' নামে বইটি বেশ জনপ্রিয় হয়েছে। তাছাড়া মালদা জেলার গম্ভীরা গান, লোকসাহিত্য, জেলার ইতিহাস, বিশেষত গণসংগ্রামের ইতিহাস ইত্যাদি বিষয় নিয়ে এখন গবেষণার কাজ শুরু হয়েছে।

১০

যোগাযোগ ব্যবস্থা

Buchanan Hamilton উনিশ শতকের গোড়ার দিককার যানবাহন ব্যবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন যে মালদা ছিল প্রচুর নদনদী বিশিষ্ট জায়গা। সুতরাং বছরের অনেকটা সময় ধরে, বিশেষত বর্ষাকালে, স্থলযান সহযোগে চলাফেরা করা প্রায় অসম্ভব ছিল। নৌকা ছিল যাত্রীদের প্রধান ভরসা। শীত ও গ্রীষ্মকালে, রাস্তাঘাট যখন শুকিয়ে যেত তখনও মালপত্রবাহী ভারি যান দূরবর্তী গ্রামাঞ্চলে যেতে পারত না। কারণ রাস্তাঘাটের অবস্থা আদৌ ভালো ছিল না। গাধা, বলদ, মহিষ প্রভৃতির পিঠে করে মালপত্র নিয়ে যাওয়া হতো। তবে শুকনো সময়ে আমদানি-রপ্তানির কাজ খুব একটা হতো না। বর্ষাকালেই নৌকা বোঝাই মালপত্র বাইরে যেত, এবং নৌকা বোঝাই মালপত্র জেলায় আসতো। কারণ শুকনো সময়ে আমদানিকৃত পণ্য জেলার বিভিন্ন বাজারে পাঠানো সম্ভব ছিল না, যেমন সম্ভব ছিল না জেলার বিভিন্ন জায়গা থেকে রপ্তানি করার পণ্য নদীর পারে নিয়ে আসা।

W. W. Hunter এর Statistical Account of the District of Malda (1876) থেকে জানা যায় যে ঊনবিংশ শতাব্দীর সপ্তম দশকেও সরকারের পূর্তবিভাগের (Public Works Department) নিয়ন্ত্রণে কোনো রাস্তা ছিল না। তবে স্থানীয় অধিকর্তার নিয়ন্ত্রণাধীনে কতগুলি রাস্তাঘাট দেখাশোনা করা হতো। সেগুলোর উল্লেখ Hunter সাহেবের বিবরণে পাওয়া যায়। এগুলোর মধ্যে ছিল ইংরেজবাজার থানার অন্তর্গত একটি পাকা ও একটি কাঁচা সড়ক। পাকা সড়কটির দৈর্ঘ্য ছিল তিন মাইল এবং এর পিছনে খরচ হতো বার্ষিক তিনশো টাকা। কাঁচা সড়কটির দৈর্ঘ্য ছিল পাঁচ মাইল এবং এটিকে সুষ্ঠুভাবে রক্ষা করতে বছরে খরচ হতো একশো টাকা। এছাড়া গুরুত্বপূর্ণ সড়কগুলোর মধ্যে অমৃতি থেকে নিমাসরাই পর্যন্ত একটি রাস্তা (দৈর্ঘ্য সাত মাইল, বার্ষিক খরচ একশো চল্লিশ টাকা), মালদা ঘাট থেকে সাঁকরোল পর্য্যন্ত দিনাজপুর রোড (দৈর্ঘ্য পঁচিশ মাইল, বার্ষিক খরচ পাঁচশো টাকা,

ইংরেজবাজার থেকে নিমাসরাই পর্যন্ত একটি রাস্তা (দৈর্ঘ্য চার মাইল, বার্ষিক খরচ চল্লিশ টাকা) প্রভৃতি। ফেরীতে যাতায়াত করার চল তখন ছিল। বিশেষত মালদা থেকে গঙ্গা পেরিয়ে রাজমহল ও মহানন্দা পেরিয়ে নিমাসরাই, মালদার লোক ফেরিতে করেই যেত। মালদা জেলায় রেললাইন তখনও আসেনি। তবে মালদার খুব কাছে রাজ-মহল পর্যন্ত রেললাইন এসে গিয়েছিল এবং মালদা থেকে দার্জিলিং পর্যন্ত রেললাইন তৈরির কাজ তখন সবে শুরু হয়েছিল। এসব সত্ত্বেও Hunter বলেছেন যে তখন পর্যন্ত জেলাব মানুষকে মূলত জলযানের উপর নির্ভর করতে হতো। Malda District Gazeteer (1918)-এর লেখক Lambourn সাহেবের লেখাতেও আমরা Hamilton বা Hunter-এর কথারই প্রতিধ্বনি দেখতে পাই যে, মালদা জেলার আভ্যন্তরীণ যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল জল-নির্ভর। কিন্তু বর্তমান মালদা জেলার জলের উপর নির্ভরশীলতা একেবারেই কমে গেছে বললেই চলে। এর কারণ দুটি—এক, পাকা সড়ক আর রেললাইন গড়ে উঠেছে এবং স্বাভাবিকভাবেই জলের উপর নির্ভরশীলতা কমেছে। এবং দুই, দেশ ভাগের পর দেখা গেছে মালদা জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত তিনটি নাব্য নদীই (মহানন্দা, পুনর্ভবা এবং টাঙন) প্রবাহিত হয়েছে বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে। তা সত্ত্বেও রাজমহল-মানিকচক ফেরি-ব্যবস্থা এবং খেজুরিয়া ঘাট-ধুলিয়ান ফেরি-ব্যবস্থা এখনও বর্তমান। এই দুই ফেরি-ব্যবস্থাই রয়েছে রাজ্য সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীনে। জেলা পরিষদের নিয়ন্ত্রণাধীনে রয়েছে ইংলিশবাজার-ওল্ড মালদা ফেরি-ব্যবস্থা। মহানন্দার উপর দিয়ে প্রচুর নৌকা দৈনিক ইংলিশবাজার থেকে ওল্ড মালদা যাতয়াত করে।

সত্তর দশকের গোড়ার দিকে ফরাক্কা ব্রিজ চালু হওয়ায় কোলকাতার সঙ্গে মালদার যোগাযোগ অনেক ভালো হয়ে গেছে। আগে কোলকাতা থেকে মালদা যেতে হলে খেজুরিয়া ঘাট পর্যন্ত ট্রেনে গিয়ে সেখান থেকে স্টিমারে করে যেতে হতো। এখন ট্রেনে বা বাসে সরাসরি ব্রিজের ওপর দিয়ে মালদায় যাওয়া যায়। ফলে শুধু মালদা নয়, সমগ্র উত্তরবঙ্গের সঙ্গে কোলকাতার যোগাযোগ সুদৃঢ় করেছে এই ফরাক্কা সেতু।

মালদা জেলাতেই পূর্বরেলের (Eastern Railway) আওতা শেষ হয় এবং মালদা টাউন স্টেশন থেকে আরম্ভ হয় উত্তর সীমান্ত রেল

(North Frontier Railway)। উত্তর সীমান্ত রেলের তিনটি বিভাগ (section) মালদা জেলায় রয়েছে। একটি বিহারের কাটিহার থেকে মালদার সিংহাবাদ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এর দৈর্ঘ্য ৮২.৫ কিলোমিটার। আর একটি ওল্ড মালদার সঙ্গে খেজুরিয়া ঘাটের যোগ স্থাপন করেছে। এর দৈর্ঘ্য ৪৩ কিলোমিটার। ১.৮ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট তৃতীয়টি বিস্তৃত হয়েছে মুকুরিয়া থেকে কুমেদপুর জংশন পর্যন্ত।

কোলকাতা থেকে শিলিগুড়ি পর্যন্ত বিস্তৃত ৩৪নং জাতীয় সড়কের অনেকটাই গিয়েছে মালদা জেলার ভিতর দিয়ে। ৩৪নং জাতীয় সড়ক মালদা জেলায় শুরু হয়েছে খেজুরিয়াঘাট থেকে। শিলিগুড়িমুখী কোনো যান এই জাতীয় সড়ক ধরে চলার সময় মুর্শিদাবাদ জেলা পেরিয়ে ফরাক্কা সেতু পার হয়ে মালদা জেলাব কালিয়াচক, ইংরেজবাজার এবং গাজোল থানা স্পর্শ করে পশ্চিম দিনাজপুর জেলায় প্রবেশ করে। মালদা জেলার উপর দিয়ে এই জাতীয় সড়কটির বিস্তৃতি ১০৭.৯ কিলোমিটার। এছাড়া মালদা জেলায় তিনটি প্রাদেশিক সড়ক (State Highways) রয়েছে। একটি ইংরেজবাজারের সঙ্গে মানিকচকের যোত্রসূত্রকারী, যার দৈর্ঘ্য ৩২.২ কিলোমিটার। দ্বিতীয়টি গিয়েছে পুরনো মালদা থেকে গাজোল পর্য্যন্ত। এর দৈর্ঘ্য ২৫.৮ কিলোমিটার। তৃতীয়টি গাজোল থানা থেকে শুরু হযে পশ্চিম দিনাজপুরের বুনিয়াদপুরে গিয়ে পৌছেছে। জেলার চারটি গুরুত্বপূর্ণ জেলা সড়কের মধ্যে গাজোল, সামসী, চাঁচোল এবং হরিশ্চন্দ্রপুরের মধ্যে যোগাযোগকারী সড়কটি বৃহত্তম এর দৈর্ঘ্য ৫৩ কিলোমিটার। এছাড়া তিনটি জেলা সড়কের মধ্যে রয়েছে গাজোল, বামুনগোলা, হবিবপুর ও বুলবুলচণ্ডীর মধ্যে যোগাযোগকারী সড়ক (দৈর্ঘ্য ৪১.৯ কিলোমিটার), মানিকচক-মথুরাপুর ও রতুয়ার মধ্যে যোগাযোগকারী সড়ক (দৈর্ঘ্য ১৬ কিলোমিটার), এবং সামসী-রতুয়া যোগসূত্র সড়কটি (দৈর্ঘ্য ১২.৯ (কিলোমিটার)। এছাড়া আরও সাতটি জেলা সড়ক রয়েছে। এদের মধ্যে দুটিকে বর্ষাকালে ব্যবহার করা যায় না। সরকারি তত্ত্বাবধানে চারটি গ্রামীণ সড়কও রয়েছে। তাছাড়া জেলা পরিষদের তত্ত্বাবধানে রয়েছে আটটি বড় রাস্তা, তেরোটি ছোট রাস্তা এবং একশো পাঁচটি গ্রামীণ রাস্তা। ১৯৮০ সাল পর্য্যন্ত নেওয়া পরিসংখ্যান থেকে পাওয়া যায় যে, মালদা জেলায় ৫৯৬ কিলোমিটার

রাস্তা সরকারি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। এর মধ্যে ৫২২ কিলোমিটার রাস্তা পাকা এবং ৭৪ কিলোমিটার রাস্তা কাঁচা।

১৯৭৭ সাল পর্যন্ত নেওয়া পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় যে, মালদা জেলায় ২১৪টি ডাকঘর, একটি প্রধান ডাকঘর (ইংরেজবাজারে অবস্থিত) এবং ৩৬টি পোস্ট ও টেলিগ্রাফ (ডাক ও তার) অফিস আছে। ত্রিশটি পোস্ট অফিস থেকে টেলিফোন করার সুবিধা রয়েছে।

মালদায় একটি বিমানবন্দর আছে। তবে যাত্রীবাহী বিমান সেখান থেকে চলাচল করে না। সাধারণত সরকারি কাজে ও আম রপ্তানির জন্য মালদার বিমান বন্দব ব্যবহৃত হয়।

১১

পঞ্চায়েত ও পুরসভা

১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দের বাংলা স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন আইন (Bengal Local Self Government Act) অনুযায়ী মালদায় ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড গঠিত হয় ১৮৮৭ খ্রীস্টাব্দে। Lambourn সাহেবের লেখা থেকে জানা যায় যে, আগে মালদা জেলায় যে ফেরি তহবিল-কমিটি ও শিক্ষা-কমিটি নামে দুটি কমিটি ছিল, সেগুলো একত্র হয়েই মালদা ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড প্রাথমিক-ভাবে তৈরি হয়েছিল। সে সময় জেলাশাসক পদাধিকার বলে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের সভাপতি নিযুক্ত হতেন। এছাড়া আরও তিন জন পদাধিকার বলে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের সদস্য পদ পেতেন এবং তেরো জন সদস্য স্থানীয় সরকার-কর্তৃক মনোনীত হতেন। তখন ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের আয়ের প্রধান উৎস ছিল রাস্তা-কর (Road cess)। এছাড়া ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের আয়ের অন্য সূত্র ছিল বিভিন্ন সেতু ও ফেরি থেকে প্রাপ্ত তোলা (toll)। বিভিন্ন খোয়াড়, দাতব্য চিকিৎসালয়, রাস্তাঘাট ও পয়ঃপ্রণালীর সুবন্দোবস্ত, পানীয় জল সরবরাহ, মহামারীর সময় টিকা দেওয়া, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় কোনো ত্রাণকার্য পরিচালনা করা, জেলার বিভিন্ন সরাইখানা দেখা-শোনা প্রভৃতি ছিল ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের তত্ত্বাবধানে। ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দের গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন আইন (Village Self Government Act) অনুযায়ী মালদা জেলায় কতগুলো ইউনিয়ন বোর্ড গঠিত হয়। ইউনিয়ন বোর্ড-গুলোর কার্যাবলীর তদারকি করার দায়িত্ব ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের উপর ন্যস্ত হয়েছিল।

মালদা জেলায় স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের সূত্রপাত ঘটে ১৮৭০ খ্রীস্টাব্দে বাংলা গ্রামীণ চৌকিদারি আইন (Bengal Village Choukidari Act) প্রণয়নের সময়। এই আইন অনুযায়ী গ্রাম পঞ্চায়েত তৈরি হয় এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে কিছু গ্রামীণ চৌকিদার নিযুক্ত হন। প্রতি গ্রাম পঞ্চায়েতে পাঁচ জন করে সদস্য জেলা কালেক্টর কর্তৃক নিযুক্ত হতেন। গ্রাম পঞ্চায়েতের কাজ ছিল চৌকিদারি কর তোলা ও গ্রামীণ পুলিশি ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণে রাখা।

১৯৬৩ খ্রীস্টাব্দের পশ্চিমবাংলা জেলা পরিষদ আইন (West Bengal Zilla Parishad Act) অনুযায়ী ১৯৬৪ খ্রীস্টাব্দে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড উঠে যায় এবং তার জায়গায় গঠিত হয় জেলা পরিষদ। এই আইনের প্রয়োগের সময় থেকে পঞ্চায়েতে দ্বিস্তর ব্যবস্থা (Two Tier System) চালু হয়। একটি স্তরে থাকে গ্রাম পঞ্চায়েত ও অন্য স্তরে থাকে অঞ্চল পঞ্চায়েত।

১৯৭৩ খ্রীস্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গে অশোক মেহ্‌তা কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী নতুন পঞ্চায়েত আইন পাশ হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই আইনকে বাস্তবায়িত করে ১৯৭৮ সালে। এই আইন অনুযায়ী মালদা জেলা সমেত পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থার প্রচলন হয়। বিভিন্ন জেলার মতো মালদা জেলাতেও সর্বোচ্চ স্তরে রয়েছে জেলা পরিষদ। ব্লক স্তরে আছে পঞ্চায়েত সমিতি। আর গ্রামীণ স্তরে আছে গ্রাম পঞ্চায়েত। মালদা জেলায় পঞ্চায়েত সমিতির সংখ্যা ১৬। গ্রাম পঞ্চায়েতের সংখ্যা ১৪৭। পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি এবং গ্রাম-প্রধান পদাধিকার বলে জেলা পরিষদের সদস্য হন। বিধানসভা ও লোকসভার সদস্যরাও পদাধিকার বলে জেলা পরিষদের সদস্য হন। জেলা পরিষদের সভাপতিকে নির্বাচিত করেন জেলা পরিষদের সদস্যরা। গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদের অন্যান্য সদস্যরা জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত হন।

মালদা জেলায় পঞ্চায়েত ব্যবস্থা তিন ধরনের কাজ করে থাকে—বাধ্যতামূলক, স্বেচ্ছাধীন এবং নির্দেশমূলক। বাধ্যতামূলক কাজের মধ্যে রয়েছে পুকুর খনন, রাস্তাঘাট নির্মাণ, জমিতে সার সরবরাহ এবং অন্যান্য উন্নয়নমূলক কাজ। বিশেষ কোনো সমস্যা দেখা দিলে, তার সমাধান করার জন্য জেলার পঞ্চায়েত ব্যবস্থা তার স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা প্রয়োগ করে। নির্দেশমূলক কার্যাবলী বলতে বোঝায় রাজ্য সরকারের নির্দেশ মেনে কোনো কাজ করা। মালদা জেলায় জেলা পরিষদ, পঞ্চায়েত সমিতি ও গ্রাম পঞ্চায়েত বর্তমানে রাজ্য সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী ভূমি সংস্কার ও অপারেশন বর্গার কাজও করছে।

উপরোক্ত কাজগুলো করার জন্য পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে যে প্রচুর ব্যয় করতে হয়; সেই অর্থ আসে বিভিন্ন সূত্র থেকে। পঞ্চায়েত সমিতির আয়ের সূত্র হলো, (১) রাজ্য সরকারের সংগৃহীত ভূমিরাজস্বের একটি

অংশ, (২) কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের কাছ থেকে প্রাপ্ত অবদান (contribution) ও অনুদান (grant), (৩) উপ আইন অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের জরিমানা, (৪) বিদ্যালয়, হাসপাতাল প্রভৃতির থেকে পাওয়া কর, (৫) যানবাহন, সেতু, ফেরি থেকে নেওয়া উপশুল্ক (toll), (৬) বিপজ্জনক ও ক্ষতিকারক ব্যবসায় করার জন্য লাইসেন্স ফি, (৭) আলোর জন্য অভিকর, (৮) হাটের লাইসেন্স ফি এবং (৯) নতুন কোনো যানবাহন প্রচলন করার জন্য রেজিস্ট্রেশন ফি।

জেলা পরিষদের আয়ের উৎস হলো (১) রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের থেকে পাওয়া অনুদান ও অবদান (২) রাস্তা কর, (৩) ভূমি-রাজস্বের একটি অংশ, (৪) আম বাগান বিক্রি করা, (৫) ফল বিক্রি করা, (৬) পুকুর লিজ দেওয়া (৭) মেলা ও হাট থেকে পাওয়া লাইসেন্স ফি, (৮) ফেরি ও খোয়াড় থেকে প্রাপ্ত কর এবং বৃত্তি কর (Professional Tax)। এছাড়া মালদাব জেলা পরিষদ উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন তহবিল (North Bengal Development Fund) থেকেও কিছু অনুদান পায়।

পুরসভা ঃ মালদা জেলায় দুটি পৌরসভা (Municipality) আছে। একটি, ইংরেজবাজাব পৌরসভা এবং অপরটি ওল্ড মালদা পৌরসভা। এই দুটি পৌরসভাই স্থাপিত হয়েছিল ১৮৬৯ খ্রীস্টাব্দের ১ এপ্রিল। এই দুটি পৌরসভাই বর্তমানে ১৯৩২ খ্রীস্টাব্দেব 'বেঙ্গল মিউনিসিপাল অ্যাক্ট' অনুযায়ী কাজ করে থাকে।

ইংরেজবাজার পৌরসভা : ইংরেজবাজার শহরের পত্তন হয়েছিল ১৬৮০-৮১ সালের কোনো এক সময়। ইংরেজ বণিকদের ডাইরি থেকে জানা যায় যে, এই সময়ে তারা রাজা রায় চৌধুরী নামে এক জমিদারের কাছ থেকে ওল্ড মালদার থেকে মাইল দুয়েক দূরে মহানন্দা নদীর পূর্ব তীরস্থ অঞ্চলটুকু তিনশো টাকার বিনিময়ে কিনে নেয়। মোগল অনুকরণে ইংরেজরা এই জায়গার নাম দেয় ইংলেজাবাদ। সেই ইংলেজাবাদই আজকের ইংরেজ-বাজার। ১৮৬৯ খ্রীস্টাব্দে ইংরেজবাজার পুরসভা তৈরি হবার পর, এর আওতায় এলো ইংরেজবাজার, মকদমপুর, হায়দারপুর ও সিঙ্গাতলা। এর আগে ইংরেজবাজারের সীমা ছিল উত্তরে কুতুবপুর থেকে দক্ষিণে

অতুল মার্কেট। ইংরেজবাজার পৌরসভা গঠিত হবার আগে ইংরেজ-বাজারের পৌরশাসন সংক্রান্ত বিভিন্ন দিক দেখাশোনা করতো চারটি স্ট্যাণ্ডিং কমিটি : (১) ফিনান্স স্ট্যাণ্ডিং কমিটি, (২) পাব্লিক হেলথ এণ্ড স্যানিটেশন স্ট্যাণ্ডিং কমিটি, (৩) পাব্লিক ওয়ার্কস্ স্ট্যাণ্ডিং কমিটি এবং (৪) লাইটিং স্ট্যাণ্ডিং কমিটি। ১৮৬৯ খ্রীস্টাব্দের পর উপরোক্ত সমস্ত কাজগুলোর দায়িত্ব এসে বর্তালো ইংরেজবাজার পৌরসভার ঘাড়ে।

পুরসভার প্রবর্তনের পর ইংরেজবাজারের সুড়কি মোড়া রাস্তা-গুলোকে বড় পাথরের কুচি দিয়ে মুড়িয়ে পাকা রাস্তা করা হলো। পথে লোহার স্তম্ভ বসিয়ে, তার গায়ে সংপৃক্ত একটি আংটায় কেরোসিন লণ্ঠন বসিয়ে আলোর ব্যবস্থা করা হলো। পুরসভা শহরের নর্দমা ব্যবস্থার সংস্কার সাধন করলো নোংরা জল নিকাশের ব্যবস্থা করে। তখন শহরের নোংরা জল ডালঘুঁটনির দাড়া দিয়ে প্রবাহিত হয়ে ভাতিয়ার বিলে গিয়ে পড়তো। দেশ ভাগের পর ভাতিয়ার বিল পুর্ব পাকিস্তানে চলে যায়। এখন তা বাংলাদেশে।

ইংবেজবাজার পুরসভায় বর্তমানে ১৬ জন কমিশনার আছেন। এরা সবাই শহরের জনসাধারণ কর্তৃক নিবাচিত। কমিশনাররা তাঁদের মধ্যে থেকে একজন চেয়ারম্যান ও একজন ভাইস চেয়ারম্যান নির্বা-চিত করেন। ইংরেজবাজার পৌরসভায় মোট ১৭টি ওয়ার্ড আছে। পুরসভার বর্তমান আয়তন ৪.৬৪ বর্গ কিলোমিটার। জনসংখ্যা—৭৯ হাজার ১৪।

পৌরসভার বিভিন্ন ধরনের দায়িত্ব পালনের মধ্যে আছে শহরাঞ্চলের রাস্তাঘাটের রক্ষণাবেক্ষণ, সুষ্ঠু নর্দমা ব্যবস্থা, শহরবাসীদের জল সরবরাহ করা, শহরে আলোর বন্দোবস্ত করা, শহর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা, শহরের পরিবেশকে দূষণ-মুক্ত রাখা এবং শহরে সুস্থ সংস্কৃতি গড়ে তোলার চেষ্টা করা।

পৌরসভার আয়ের বিভিন্ন ধরনের উৎস রয়েছে। যেমন, সম্পত্তি কর, বৃত্তিকর, ঘরভাড়া, বাজার টোল, টমটম বা রিক্শা থেকে পাওয়া কর প্রভৃতি। এছাড়া সরকারি সাহায্যের মধ্যে আছে সাহায্য-ভাতা, অকৃট্রয় বা চুঙ্গি কর, উন্নয়ন অনুদান এবং সরকারি ঋণ। ১৯৮১-৮২

সালে ইংরেজবাজার পৌরসভার জনগণের থেকে পাওয়া মোট আয়ের পরিমাণ ছিল ১৭,২৭,৭৯০.০০ টাকা আর সরকারি সাহায্যের পরিমাণ ছিল ৪৭,০৯,৮০০.০০ টাকা। এই পৌরসভাব মাসিক আয়ের লক্ষ্য চার লক্ষ টাকা আর মাসিক ব্যয় তিন লক্ষ টাকা। তা সত্ত্বেও ভারতবর্ষের অর্থনীতির সঙ্গে তাল রেখে অকল্পনীয় ঘাটতির বোঝা নিয়ে চলছে ইংরেজবাজার পৌরসভা। এই পৌরসভার বার্ষিক ঘাটতি প্রায় ১২ লক্ষ টাকার মতো।

১২

বিশিষ্ট স্থানের বিবরণ

গৌড়ঃ মালদা জেলার বিশিষ্ট স্থানের বিবরণ দিতে গেলে প্রথমেই যে অঞ্চলের নাম মনে আসে, তা হলো গৌড়। ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে কোলকাতা থেকে মালদা অভিমুখে যাত্রা করলে ফরাক্কা সেতু পার হবার খানিক পরেই ডান দিকে দেখা যায় গৌড়ের রাস্তা। গৌড় অঞ্চলের স্থাপত্য সমূহ রয়েছে ইংরেজবাজার মহদীপুর সড়কের উপরে। গৌড় নগরী একটা চওড়া প্রাচীর দিয়ে ঘেরা ছিল, যার ভগ্নাবশেষ এখনও চোখে পড়ে এই প্রাচীরের উচ্চতা কম করে ত্রিশ ফুট এবং প্রস্থ পঞ্চাশ গজ। কোনো কোনো ঐতিহাসিকের অভিমত সামরিক কারণে এবং প্রতিরক্ষার তাগিদেই এই প্রাচীর নির্মিত হয়েছিল। কেউ বা মনে করেন শত্রুর হাত থেকে নয়, নদীর হাত থেকে বাঁচার তাগিদেই এই প্রাচীর। অবশ্য আইন-ই আকবরীতে এই প্রাচীরকে বন্যার হাত থেকে বাঁচার জন্য বাঁধ হিসেবেই বর্ণনা করা হয়েছে।

গৌড় যাবার রাস্তার বাঁদিকে নেমে গেলেই পড়ে ফুলবাড়ি দরজা—যদিও এই দরজার কোনো অস্তিত্বই এখন চোখে পড়ে না। আর খানিকটা গেলেই দেখা যায় রামকেলি অঞ্চল। এখানেই রূপ আর সনাতনের সঙ্গে শ্রীচৈতন্যের সাক্ষাৎ ঘটেছিল। একটি মন্দিরে শ্রীচৈতন্যের পদচিহ্ন সংরক্ষিত আছে।

আর একটু এগোলেই দেখা যাবে বড় সোনা মস্‌জিদ। এর আর এক নাম বারদুয়ারী। এই মসজিদের ১১টি চূড়া আছে। চূড়াগুলি এক সময় সোনা দিয়ে মোড়া ছিল। তাই হয়তো এর নাম হয়েছিল, বড় সোনা মসজিদ। কিন্তু বারদুয়ারী নাম কেন হয়েছিল তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কেউ বলেন মসজিদের বারোটা দরজা ছিল বলেই নাকি এর নাম বারদুয়ারী। কিন্তু এই ব্যাখ্যা সহজে গ্রহণ করা যায় না; কারণ এই মসজিদের দরজার সংখ্যা এগারো।

বারদুয়ারীর আধ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত দাখিল দরওজা। বলা হয়, এইটিই গৌড় অঞ্চলের প্রবেশ দ্বার। দাখিল দরওজার অভ্যন্তরে

প্রবেশ করলে, দুপাশে কতগুলি ঘর দেখা যায়। বলা হয় এই ঘরগুলিতে থাকতো নগররক্ষীরা। এক-একটি ঘরের দেয়াল কম পক্ষে ১০ ফুট পুরু। দাখিল দরওজার খানিক দূরেই ফিরোজ মিনার। ফিরোজ মিনারের উচ্চতা ৮৪ ফুট এবং পরিধি প্রায় ৬৫ ফুট। ফিরোজ মিনারের ভিতর দিয়ে উঠে গেছে একটি খাড়া সিঁড়ি। বলা হয়, সৈফুদ্দিন ফিরোজ শাহ্ কোনো এক যুদ্ধ জয়ের পর, তার জয়কে অমর করে রাখার জন্য এই মিনার তৈরি করেছিলেন।

ফিরোজ মিনারের কাছেই চামকাঠি মসজিদ্। এই মসজিদ্ ভারতীয় প্রস্তরকলার এক অপূর্ব নিদর্শন। নানা রঙের পাথর দিয়ে এই মস্জিদ তৈরি। এর নাম চামকাঠি কেন হলো তা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মত-পার্থক্য রয়েছে। চামকাঠি কথার অর্থ হলো চর্মকার। বলা হয়, এক বিশেষ গোষ্ঠীভুক্ত দরবেশদের শিল্পনৈপুণ্যে এই মস্জিদ তৈরি হয়েছিল। এই দরবেশরা পাথর কাটার কাজ করতেন চামড়া কাটার ছুড়ি দিয়ে। তাই এর নাম হয়েছে চামকাঠি মসজিদ্। চামকাঠি মসজিদের খুব কাছেই রয়েছে লুকোচুরি দরজা। এই দরজা উচ্চতায় ৬৫ ফুট এবং প্রস্থে ৪২ ফুট। পণ্ডিতেরা এটাকে কোন দুর্গের প্রবেশদ্বার হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তবে এই দরজার নাম 'লুকোচুরি' হলো কেন, সে বিষয়ে কোনো সঠিক সিদ্ধান্তে আসা যায়নি। এই দরজার আরেক নাম শাহ্-ই-দরওয়াজা—যার অর্থ রাজার ফটক। বলা হয়, শাহ্ সুজা যখন বাংলার সুবেদার ছিলেন, তখন তিনি প্রাসাদে প্রবেশ করার সময় এই ফটকটি ব্যবহার করতেন। তার থেকেই বোধহয় লুকোচুরি দরজার নাম হয়েছিল রাজার ফটক।

লুকোচুরি দরজার কাছেই কদম রসুল। এখানে হজরত মহম্মদের পদচিহ্ন সংরক্ষিত রয়েছে। কদম রসুল টেরাকোটার কাজের এক অতি উৎকৃষ্ট নিদর্শন। দু ইঞ্চি পুরু একটি পাথরের গায়ে মহম্মদের পদচিহ্ন খোদাই করা রয়েছে। বলা হয়, ফকির জালালুদ্দিন তাব্রেজির কাছ থেকে, হোসেন শাহ্ এই পদচিহ্ন এনেছিলেন। পরবর্তীকালে, বাংলার নবাব সিরাজ-উদ্-দৌল্লা এই পদচিহ্ন নিয়ে যান মুর্শিদাবাদে। পরে মিরজাফর আবার তা গৌড়ে ফিরিয়ে আনেন। কদম রসুলের গা ঘেঁসে রয়েছে বাদশাহ্ আওরংজেবের এক বিশ্বস্ত রাজপুরুষ দিল্লু খাঁর পুত্র ফতে

খাঁর সমাধি।

কদম রসুলের খুব কাছে রয়েছে চিকা মস্‌জিদ্। এই প্রাসাদ পুনর্গঠিত হওয়ার আগে প্রচুর চামচিকার আশ্রয়স্থল ছিল। চামচিকার দুর্গন্ধে এর কাছ দিয়েও কেউ যেতে পারতো না। তাই স্থানীয় লোকেরা এর নাম দিয়েছে চিকা মস্‌জিদ্। চিকা মস্‌জিদ্, আদৌ মস্‌জিদ্ কিনা সে বিষয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতান্তর রয়েছে। কারণ প্রার্থনা করার মতো কোনো বিশেষ স্থানই এর অভ্যন্তরে চোখে পড়ে না। কানিংহাম সাহেব এটাকে একটি সমাধিস্থল হিসেবে বর্ণনা করেছেন। এমন কি পাণ্ডুয়ার একলাক্ষি সমাধিস্থলের সঙ্গেও তিনি এর মিল খুঁজে পেয়েছেন। কোনো কোনো পণ্ডিত আবার বলেছেন যে চিকা মসজিদ ছিল একটি জেলখানা।

চিকা মস্‌জিদের সামান্য পূবে অবস্থিত গুমতি দরজা। এক চূড়া বিশিষ্ট এই বাড়িটি কারোর মতে প্রাসাদ অঞ্চলে প্রবেশের একটি তোরণ। আবার কেউ মনে করেন, এটি ছিল কয়েদখানার কর্মচারীদের আবাসস্থল।

গুমতি দরজার পশ্চিমে রয়েছে রাজপ্রাসাদ। এই প্রাসাদ 'বাইশ গজী' নামে এক পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। পাঁচিলের উচ্চতা বাইশ গজ বলেই এর নাম 'বাইশ গজী,' গোড়ার কাছে এর প্রস্থ ১৫ ফুট আর উঁচুতে এর প্রস্থ ৯ ফুট। বাইশ গজীর খুব কাছেই রয়েছে খাজাঞ্চিখানা। খাজাঞ্চিখানার কাছেই আছে একটা বড় দিঘি। স্থানীয় লোকেদের কাছে এ দিঘির নাম টাকশাল দিঘি।

প্রাসাদ অঞ্চলের সামান্য দক্ষিণে রয়েছে তাঁতিপাড়া মস্‌জিদ্। এর দেয়াল ৬½ ফুট পুরু। এই মস্‌জিদ্‌টিও ইটের কাজের সুন্দর নিদর্শন। মস্‌জিদের চূড়ায় রয়েছে চারটি সুদৃশ্য প্রস্তর স্তম্ভ। কানিংহাম সাহেবের কথায়, "To my taste this mosque is the finest of all the buildings now remaining in Gaur." অর্থাৎ তাঁর কাছে গৌড়ের যাবতীয় প্রাসাদের মধ্যে তাঁতিপাড়া মসজিদ সব থেকে সুন্দর লেগেছিল। তাঁতিপাড়া নাম কেন হয়েছিল তা নিয়ে যথেষ্ট সংশয় আছে। তবে ধরে নেওয়া হয় যে মস্‌জিদের কাছাকাছি কোথাও তাঁতিদের বসবাস ছিল। ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দের ভূমিকম্পে এই মস্‌জিদের অনেকটা অংশ নষ্ট হয়ে গেছে। ক্রেটন সাহেবের অনুমান, এই মস্‌জিদের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে

একটি প্রাসাদ ছিল, যা এখন ধ্বংসপ্রাপ্ত। এই প্রাসাদটি ছিল পথচারী-দের বিশ্রামাগার অথবা একটি মাদ্রাসা।

আরও মাইল খানেক দক্ষিণে অবস্থিত লোটন মস্‌জিদ্। কানিংহাম সাহেবের চোখে চামকাঠি মস্‌জিদের সঙ্গে লোটন মস্‌জিদের সাদৃশ্য ধরা পড়েছে। দুটিই চৌকো ধাঁচের মস্‌জিদ্ এবং দুটির সামনেই চওড়া বারান্দা রয়েছে। লোটন মস্‌জিদ্ দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে ৩৪ ফুট। আর সামনের অলিন্দটি ৩৪ ফুট লম্বা এবং ১১ফুট চওড়া। লোটন মস্‌জিদ্‌টি রংবেরঙের ইট দিয়ে তৈরি। সময়ের দাপটে রং এর উজ্জ্বলতা কমে এলেও, এর সৌন্দর্য্য এখনও পথিকের চোখে ধরা পড়ে। লোটন মস্‌জিদ্ নামকরণ নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতান্তর আছে। লোটন কথাটি বাংলা 'নটী' শব্দের অপভ্রংশ বলে অনেকে দাবি করেছেন। নটী কথার অর্থ নর্তকী। কারো মতে কোনো এক নর্তকী এই মস্‌জিদ্ তৈরি করেছিলেন বলেই এর নাম হয়েছিল লোটন মস্‌জিদ্। কেউ কেউ মনে করেন এই মস্‌-জিদের বহিরাবরণের রঙীন ঝলকানি কোনো নর্তকীর পোশাকের সদৃশ্য বলেই এর নাম হয়েছিল লোটন মস্‌জিদ।

সমগ্র গৌড় অঞ্চলেই ছোট বড় বিস্তর দিঘি দেখতে পাওয়া যায়। লোটন মস্‌জিদের উত্তর পূর্বে অবস্থিত ছোট সাগরদিঘি। এর দৈর্ঘ্য সাতশো গজ এবং প্রস্থ চারশ কুড়ি গজ। পিয়াসবাড়ি ডাকবাংলোর কাছে আরেকটি বড় দিঘি রয়েছে। তবে মালদা জেলায় সবথেকে বড় দিঘির নাম সাগর দিঘি। ১,৫১৮ গজ লম্বা ও ৭৭৮ গজ চওড়া এই দিঘিটি দ্বাদশ শতকে লক্ষণ সেন-কর্তৃক নির্মিত হয়েছিল বলে কথিত আছে। গৌড়ের খুব কাছে, সহুল্লাপুরের সামান্য উত্তরে এই দিঘি অবস্থিত। বর্তমানে সরকারি তত্ত্বাবধানে এখানে মৎস্য চাষ হয়।

মালদা জেলার আর একটি বিশিষ্ট স্থান হলো পিছলি। ইংরেজ-বাজারের মাইল আটেক উত্তর পশ্চিমে এবং কালিন্দ্রী নদীর দক্ষিণ তীরে পিছলি অবস্থিত। আবিদ আলি দাবি করেছেন, মধ্যযুগীয় বাংলাদেশের এক সমৃদ্ধশালী অঞ্চল ছিল এই পিছলি। ১২২০ খ্রীস্টাব্দে সুলতান গিয়াসুদ্দিন ইউয়াজ কালিন্দ্রীর পারে একটি দুর্গ নির্মাণ করেছিলেন। Buchanan Hamilton সাহেব অবশ্য বলেছেন যে পিছলি বাংলার রাজধানী ছিল প্রাচীন হিন্দু রাজা আদিশূরের আমলে। পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করার জন্য

আদিশূর কনৌজ থেকে প্রচুর ব্রাহ্মণ আনিয়েছিলেন। কথিত আছে, এরাই বাংলাদেশের ব্রাহ্মণদের আদি পুরুষ। কানিংহাম সাহেব পিছলির খুব কাছ থেকে ১১৪৯ খ্রীস্টাব্দের একটি শিলালিপি উদ্ধার করেছিলেন। দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে শিলালিপিটির আয়তন সাত ফুট ও দেড় ফুট। শোনা যায় বর্তমানে শিলালিপিটি কোতয়ালির জমিদারদের তত্ত্বাবধানে আছে। বর্তমানে পিছলির প্রাচীন গৌরবের কিছুই দেখতে পাওয়া যায় না। পিছলি এখন গুরুত্বহীন একটি গ্রাম।

আর একটি প্রাচীন গুরুত্বের অধিকারী অঞ্চল বল্লালবাটী। ইংরেজ-বাজার থেকে মাইল দুয়েক উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত। দ্বাদশ শতকের মাঝামাঝি বঙ্গেশ্বর বল্লালসেন এই অঞ্চলকে রাজধানীতে পরিণত করেন। আবিদ আলির মতে বল্লালবাটী গৌড়ের প্রাচীনতম অংশ।

পাণ্ডুয়া ঃ হুগলি জেলাতেও পাণ্ডুয়া বলে একটি জায়গা আছে। খুব সম্ভবত হুগলির পাণ্ডুয়া থেকে মালদার পাণ্ডুয়াকে পৃথক করার জন্যই লোকেরা মালদার পাণ্ডুয়াকে 'হজরত পাণ্ডুয়া' নামে অভিহিত করতো। এমন কি বিংশ শতকের গোড়ার দিক পর্যন্ত এই নামটি প্রচলিত ছিল। ওল্ড মালদার মাইল ছয়েক উত্তরে পাণ্ডুয়া অবস্থিত। ৩৪নং জাতীয় সড়ক ধরে এগিয়ে গেলে ওল্ড মালদার উত্তরে এবং গাজোল থানার দক্ষিণে বাঁ হাতে প্রাচীন পাণ্ডুয়া শহরের পুরাকীর্তির কিছু কিছু অংশ চোখে পড়ে।

মধ্যযুগে এর নাম হয়েছিল ফিরোজাবাদ। রেনেল সাহেব তাঁর মানচিত্রে এই অঞ্চলকে পিরুয়া (Pirrua) বলে বর্ণিত করেছেন। পাণ্ডুয়া মধ্যযুগে একটি গুরুত্বপূর্ণ নগরী হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল না প্রাচীনকালে হিন্দু রাজাদের আমলেও এর যথেষ্ট গুরুত্ব ছিল তা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। রিয়াজ-উস্-সালাতিন থেকে জানা যায় যে শামসুদ্দিন ইলিয়াশ শাহ্ সুলতান আলাউদ্দিন আলি শাহ্কে হত্যা করে পাণ্ডুয়াতে বাংলার সিংহাসনে বসেন। রিয়াজের মতে ইতিহাসে এই প্রথম পাণ্ডুয়ার উল্লেখ পাওয়া যায়। আবিদ আলির মতে পাণ্ডুয়া মধ্য যুগে মুসলমান আমলে বাংলার রাজধানী ছিল। হ্যামিলটন সাহেবের ধারণা পাণ্ডব বংশীয় কোনো রাজা পাণ্ডুয়া নগরী তৈরি করেছিলেন।

নিজের বক্তব্যের সমর্থনে তিনি বলেছেন যে পঞ্চদশ শতকীয় কতগুলি মুদ্রায় পাণ্ডুয়া পাণ্ডব নগরী হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। পাণ্ডুয়া অঞ্চলের একটি ছোট দালান পাণ্ডব রাজার দালান হিসাবে পরিচিত। এই দালানের নাম ও অস্তিত্ব হ্যামিলটন সাহেবের অনুমানের সত্যতা বাড়িয়ে দিয়েছে।

পাণ্ডুয়া নগরী যে আয়তনে বিশাল ছিল এ বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। পণ্ডিতেরা অনুমান করেছেন যে এর আয়তন প্রায় পঁচিশ বর্গমাইল। পাণ্ডুয়ার উত্তর পূবে দমদমা গ্রাম (যার স্থানীয় নাম পুর বিনোদপুর) আর পশ্চিমে বুর্গপুর গ্রাম। বুর্গ কথাটি একটি ফার্সি কথা। এর অর্থ দুর্গ। বুর্গ কথাটি থেকে অনেকে অনুমান করেছেন যে পাণ্ডুয়া নগরী মুসলমান রাজাদের আমলেই যথেষ্ট গুরুত্ব অর্জন করেছিল। কিন্তু এই বুর্গপুর গ্রামের আবার এক কানুনগো, এক অতি প্রাচীন মন্দির থেকে শিবলিঙ্গ আবিষ্কার করেছিলেন। তা ছাড়া, ঐ অঞ্চলের অধিকাংশ পুকুরই উত্তর-দক্ষিণে কাটা। এর থেকে হ্যামিলটন সাহেব অনুমান করেছেন যে এই পুকুরগুলি হিন্দু রাজাদের আমলেই খোঁড়া হয়েছিল।

রানীগঞ্জ বাজারের কাছে বোগলাহাগি মৌজায় কিছু পুরনো দালানের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। অনুমান করা হয় এই অঞ্চলটিতে একটি বড় দুর্গ ছিল। কারণ এই ধ্বংসপ্রাপ্ত দালানের তিন দিকে তিনটি বড় গর্ত ছিল আর চতুর্থ দিকটি ছিল টাঙন নদী দিয়ে ঘেরা।

পাণ্ডুয়ায় প্রবেশ করলেই পশ্চিম প্রান্তে চোখে পড়ে বড়ী দরগাহ। বড়ী দরগাহের অভ্যন্তরে রয়েছে জামী মসজিদ্ এবং হজরতশাহ্ জালাল তাব্রেজির স্মৃতিরক্ষাকারী বিভিন্ন স্তম্ভ। তাব্রেজি পারস্যদেশের তাব্রেজ অঞ্চল থেকে ভারতবর্ষে এসেছিলেন। প্রথমে তিনি দিল্লিতে বসবাস শুরু করেন। তারপর তিনি আসেন বাংলাদেশে। বাংলাদেশে এসে মুসলমান ধর্মের এক একনিষ্ঠ প্রচারক হিসেবে তিনি খ্যাতি লাভ করেন। তিনি কোথায় দেহত্যাগ করেছিলেন তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। কেউ বলেন তিনি মারা যান শ্রীহট্টে, আবার কারো মতে মল্লদ্বীপে তিনি দেহরক্ষা করেন। সুতরাং পাণ্ডুয়ার বড়ী দরগায় যে সমাধিটি রয়েছে, সেটি জালাল তাব্রেজির সমাধি কিনা, তাই নিয়ে মতভেদ রয়েছে। এই সমাধিকে অটুট

রাখার জন্য যাবতীয় খরচাপাতি বহন করে বাইশ হাজারী ওয়াকফ এস্টেট। বলা হয়, এই ওয়াকফ এস্টেটের মালিক ছিলেন শাহ জালাল স্বয়ং। বড়ী দরগার অভ্যন্তরে রয়েছে একটি তোরণ দ্বার, যার নাম সালামী দরওজা। সালামী দরওজা দিয়েই জামী মসজিদে প্রবেশ করতে হয়। ১৩৪১ খ্রীস্টাব্দে সুলতান আলাউদ্দিন আলি শাহ জালাল তাব্রেজির সাধনা করার জন্য এই মসজিদটি নির্মাণ করেছিলেন। এই মসজিদের সামনে তুটো কারুকার্য-খচিত স্তম্ভ রয়েছে। অনেকের ধারণা, এই স্তম্ভ তুটো প্রাচীন হিন্দু স্থাপত্যের পরিচয়বাহী। জামী মস্‌জিদের পশ্চিম প্রান্তে আজিমা দীঘি নামে একটি জলাশয় রয়েছে। এই জলাশয়ের উত্তর তীরে লক্ষ্মণসেনী দালান অবস্থিত। আজমা দিঘির পুব প্রান্তে তুটি পুরনো দালান চোখে পড়ে। একটির নাম ভাণ্ডারখানা ও অপরটির নাম তন্নুর খানা (রান্না ঘর)। ভাণ্ডারখানার এক জায়গায় সাধনা করার একটি 'আস্তানা' রয়েছে। এটি তৈরি করেছিলেন চাঁদ খান। জামী মসজিদের সামান্য দক্ষিণ পূর্বে রয়েছে চাঁদ খানের সমাধি।

বড়ী দরগার থেকে ? মাইল দূরে রাস্তার অপর প্রান্তে অবস্থিত ছোট দরগা। এই দরগা আতাউল হক্ এবং তাঁর পুত্র কুতবুল আলম—এই তুই ফকিরের স্মৃতি রক্ষাকারী। এই তুই মুসলমান সাধকের স্মৃতিরক্ষাকারী স্তম্ভগুলিকে অটুট রাখার জন্য যাবতীয় ব্যয়ভার বহনের দায়িত্ব নিয়েছে শ' হাজারী এস্টেট। ছোট দরগার সামান্য বাঁদিকে রয়েছে অতিথিশালা। সেখানে এখন একটি ডাকঘর হয়েছে।

অতিথিশালার পিছনেই রয়েছে কুতুবশাহী মস্‌জিদ্। এর আরেক নাম সোনা মস্‌জিদ্। পাণ্ডুয়ার অন্যান্য দালানের তুলনায়, এটি অপেক্ষাকৃত নতুন। এর স্থাপনের সময় ১৫৮২ খ্রীস্টাব্দ। পাথর ও ইটের সমন্বয়ে এই মসজিদটি তৈরি। এর ছাদ ধ্বসে পড়লেও এর দেয়ালগুলো ভালো অবস্থাতেই আছে।

কুতুবশাহী মসজিদের কাছেই একলাখি সমাধি। এখানে সমাধিস্থ রয়েছেন গনেশ পুত্র যতু জালালুদ্দিন, তাঁর স্ত্রী ও পুত্র। একটি মাত্র গম্বুজ বিশিষ্ট এই সমাধিস্থলটি বাংলার টেরাকোটা শিল্পের অত্যন্ত সুন্দর নিদর্শন। সমাধিস্থলের গায়ে কিছু হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি চোখে পড়ে। এর থেকে অনুমান করা যায় যে ধ্বংসপ্রাপ্ত কোনো হিন্দু মন্দিরের ইট এই সমাধি

তৈরির সময় ব্যবহৃত হয়েছিল। এই সমাধি ভবন ভারতীয় এবং পারস্যের শিল্পকলার সংমিশ্রণে তৈরি। সমাধি ভবনের চারিদিকে চারটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ আছে। কথিত আছে এই প্রকোষ্ঠে বসে হাফেজরা কোরান পাঠ করতেন।

একলাখি সমাধিকে পিছনে ফেলে আরও মাইল খানেক উত্তরে গেলে চোখে পড়ে সুবিশাল আদিনা মসজিদ। আদিনা মালদা জেলার যাবতীয় প্রাচীন দালানগুলোর মধ্যে সব থেকে বড় তো বটেই, সমালোচকদের চোখে এর সৌন্দর্যও অন্য সব দালানকে ছাড়িয়ে গেছে। উত্তর-দক্ষিণে এর দৈর্ঘ ৫০৭ ফুট আর পূর্ব-পশ্চিমে এর প্রসার ২৮৫ ফুট। এই মসজিদে ৩০৬টি গম্বুজ রয়েছে। যে স্তম্ভগুলোর উপর গম্বুজগুলো বসানো, সে-গুলোর উচ্চতা প্রায় বিশ ফুট। বাংলার সুলতান সিকন্দর শাহের আমলে এই মসজিদটি তৈরি হয়। আবিদ আলি বলেছেন, এই মস্‌জিদের নির্মাণ কার্য আরম্ভ হয় ১৩৬৪ খ্রীস্টাব্দে এবং সম্পন্ন হয় ১৩৭৪ খ্রীস্টাব্দে। এই সময়কাল সিকন্দর শাহেরই রাজত্বকাল। তবে এ বিষয়ে অনেকে ভিন্ন-মতও পোষণ করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, অতি প্রাচীনকালে এটি একটি আবাসিক বিদ্যালয় ও বৌদ্ধ বিহার ছিল। মধ্যযুগে মুসলমান শাসকরা এটিকে একটি মসজিদে পরিণত করেন। এই সমস্ত পণ্ডিতেরা নিজেদের বক্তব্যকে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে যুক্তি দিয়েছেন যে এই বৌদ্ধ বিহারের নাম ছিল আদিনাথ বিহার। আদিনাথ মহাযানী বৌদ্ধদের এক লৌকিক দেবতা। আদিনাথ থেকেই নাকি এই মসজিদের নাম হয়েছিল আদিনা মসজিদ। কিন্তু এই বক্তব্য সমর্থন করা যায় না। কারণ আদিনাথ বৌদ্ধ বিহারের অস্তিত্বের উল্লেখ কোথাও পাওয়া যায় না। তাছাড়া আদিনাথ থেকে আদিনা নামটি এসেছিল এ কথাও আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ আদিনা একটি ফার্সি শব্দ, যার অর্থ শুক্রবার। এই শুক্রবার মুসলমান সম্প্রদায়ের কাছে অতি পবিত্র দিন। সুতরাং চতুর্দশ শতকে সিকন্দর শাহ কর্তৃক যে এই মস্‌জিদ তৈরি হয়েছিল, সে বিষয়ে আমরা সুনিশ্চিত। তাছাড়া মসজিদটির শিল্পগত আঙ্গিক কানিং-হাম, ফার্গুসন প্রমুখ পণ্ডিতকে এর প্রতিষ্ঠাকালকে মধ্যযুগীয় হিসেবে চিহ্নিত করতে সহায়তা করেছে।

মস্‌জিদের উত্তর প্রান্তে সামান্য উঁচু একটি বেদী রয়েছে। এর নাম

বাদশাহ কি তখ্ত। অনুমান করা হয় রাজ পরিবারের মহিলারা এই তখ্তের ওপর বসে প্রার্থনায় যোগ দিতেন, বাদশাহ কি তখ্তের উল্টো-দিকে রয়েছে সিকন্দর শাহের সমাধি।

পাণ্ডুয়াতে অন্যান্য দ্রষ্টব্য স্থান রয়েছে প্রাসাদ অঞ্চলের কাছাকাছি। আদিনা মসজিদের উল্টো দিক দিয়ে অর্থাৎ ৩৪নং জাতীয় সড়ক ধরে পশ্চিম দিনাজপুরেব দিকে এগোলে ডান দিকে একটা সরু রাস্তা চলে গেছে। এই রাস্তা ধরে মাইল খানেক এগোলে বেশ কিছু পুরনো দালানের ভগ্নাবশেষ চোখে পড়ে। বুখানান হ্যামিলটন সাহেবের মতে এইখানেই রাজপ্রাসাদ ছিল। কানিংহামও এ বিষয়ে একমত হয়েছেন। প্রাসাদের সামনে একটি বড় দিঘি আছে যাব নাম ধণুষ দিঘি। এর খুব কাছেই সাতাশঘরা দিঘি। সাতাশঘরা দিঘির পাশেই একটি ভগ্নস্তূপ চোখে পড়ে। পণ্ডিতদের মতে এটি ছিল হামামখানা বা স্নান করার জায়গা। হ্যামিলটন সাহেব এই দীঘিকে 'ষাটসঘরা' দীঘি বলে চিহ্নিত করেছেন। হামাম-খানায় ষাটটি ঘব ছিল বলেই নাকি এই নাম। কিন্তু আবিদ আলি এই দিঘিকে সাতাশঘবা দীঘি বলেছেন। হামামখানাটি সাতাশ ঘর বিশিষ্ট ছিল বলেই এই নাম। কাছাকাছি আব একটি দিঘি আছে যার নাম নাসিব শাহ দিঘি। নাসিরুদ্দিন নুসরত শাহ দিঘিটি খনন করেছিলেন বলেই এর নাম নাসির শাহ দিঘি। এই অঞ্চলের সব থেকে বড় দিঘির নাম সুখান দিঘি। নামটি প্রমাণ কবে যে, দিঘিটি শুকিয়ে গেছে।

পুরোনো মালদা বা ওল্ড মালদা : আগে শহরটি পাঁচ অংশে বিভক্ত ছিল—কাটরা, মোগলটুলি, শর্বরী, শাকমোহন ও বাঁশহাটা। গৌড় থেকে মাইল তেরো দূরে ইংরেজ বাজারের মাইল চারেক উত্তরে কালিন্দ্রী ও মহানন্দার সঙ্গমস্থলে অবস্থিত এই শহরটি মধ্যযুগে যে বাণিজ্যের এক গুরুত্বপূর্ণ প্রাণকেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠেছিল—একথা আগেই আলোচিত হয়েছে। শুধু মধ্যযুগ কেন, মধ্যযুগ যখন শেষ তখনও ফরাসি, ডাচ ও ইংরেজ বণিকরা ওল্ড মালদায় পা দিয়েছিল সুতি ও রেশম বস্ত্র-ব্যবসায়ের মাধ্যমে নিজেদের ভাগ্য গড়ে তোলার জন্য। যাই হোক, এই শহরের আঁকাবাঁকা গলিপথ, গা ঠেলাঠেলি করা বাড়িঘর, পুরোনো ধাঁচের পয়ঃ-প্রণালী—এই শহরের প্রাচীনত্বের ইঙ্গিত বহন করে।

ওল্ড মালদায় সব থেকে পুরনো মসজিদের নাম ফুটি মসজিদ। এটি তৈরি হয়েছিল ১৪৯৫ খ্রীস্টাব্দে। ওল্ড মালদায় আর একটি মসজিদ আছে, যার নাম জামী মসজিদ। তুই গম্বুজ বিশিষ্ট এই মসজিদটি লম্বায় ৭১ফুট আর প্রস্থে ২৭ফুট। মহানন্দা নদীর পশ্চিমে রয়েছে একটি বিশাল স্তম্ভ —যার নাম নিমাসরাই। কারো মতে এই স্তম্ভের আসল নাম নিমাই সরাই। শ্রীচৈতন্য এখানে এসেছিলেন। সেই থেকে তাঁর নাম অনুসারে স্তম্ভটিব নাম হয়েছে নিমাই সরাই। কিন্তু আরেকদল পণ্ডিত মনে করেন স্তম্ভটির আসল নাম নিম্‌সবাই। নিম্‌ একটি ফার্সি কথা। এর অর্থ অর্ধেক। অর্ধেক সরাইখানার কাজ করতো বলে (এখানে থাকার বন্দো-বস্ত ছিল না, শুধু খাবার ব্যবস্থা ছিল) এর নাম হয়েছিল নিম্‌সরাই। পরে স্থানীয় লোকেদেব ভাষায় নিম্‌সরাই নিমাসরাইতে পরিণত হয়েছে। এই সরাইটি মাসুম নামে এক বিখ্যাত সওদাগরের শাতা কর্তৃক নির্মিত হয়েছিল বলে শোনা যায়।

চাঁচোল ও কলিগ্রাম : এই অঞ্চল তুটি মালদহ জেলাব উত্তরে অবস্থিত ও খরবা থানাব অন্তর্গত। মোগল সেনাপতি মানসিংহ তাঁর চাঁচোলের যাবতীয় সম্পত্তি এক যশোহরবাসী ব্রাহ্মণকে দান করেন। এই ব্রাহ্মণ ও তাঁর বংশধরেরা চাঁচোলে জমিদারি প্রতিষ্ঠা করেন। ১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দে কর্নওয়ালিশের সঙ্গে চাঁচোলের জমিদার চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের চুক্তিতে আবদ্ধ হন। বিংশ শতাব্দীতেও যে চাঁচোলের জমিদারের সঙ্গে ব্রিটিশ সরকারের সম্পর্ক অটুট ছিল তার প্রমাণ ১৯১৩ খ্রীস্টাব্দে জমিদার শরৎচন্দ্র ব্রিটিশরাজের কাছ থেকে 'রাজা' উপাধি লাভ করেছিলেন। চাঁচোলের রাজবাড়িতে এখন তৈরি হয়েছে চাঁচোল কলেজ।

চাঁচোলের অল্প দূরেই কলিগ্রাম একসময় সংস্কৃত চর্চার এক গুরুত্ব পূর্ণ কেন্দ্রবিন্দু ছিল। কলিগ্রামে রয়েছে জিন্দাপীর মসজিদ। কথিত আছে, সূর্য খাঁ নামে এক ফকির ছয়মাসের উপযুক্ত খাবার নিয়ে এখানে সমাধিস্থ হয়েছিলেন।

প্রাচীনকাল থেকে শুরু করে আধুনিককাল পর্যন্ত মালদা জেলা অসংখ্য ঘটনার নীরব সাক্ষী। প্রাচীন যুগে গৌড় নগরী সমৃদ্ধির শিখরে উঠেছিল, রামাবতী স্বাধীন বাংলার স্বাধীন রাজধানী হিসেবে চিহ্নিত

হয়েছিল। মধ্যযুগের লখনৌতি ও পাণ্ডুয়া তদানীন্তন বাংলার রাজনীতিতে অসম্ভব গুরুত্ব পেয়েছিল। আধুনিক যুগে, ঔপনিবেশিক শক্তির ভাগ্য নির্ধারণের এক সফল অঞ্চল হিসেবে প্রতিভাত হয়েছিল ইংরেজবাজার। ঔপনিবেশিক শক্তি তার জাল ছড়িয়ে দেওয়ার পর, এই মালদা জেলা পরিণত হয়েছিল সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী লড়াইয়ের অন্যতম পীঠস্থানে। আলোচনার সুবিধার্থে আমরা তিনটি যুগে জেলার ইতিহাসকে বিভক্ত করেছি। উৎপাদন-পদ্ধতিকে যদি আমরা যুগ ভাগের মাপকাঠি হিসেবে গ্রহণ করি, তবে দেখব, প্রাচীন যুগ এবং মধ্য যুগের মধ্যে কোনো তফাত করা যায় না—কারণ সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করেই প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় মালদার অর্থনীতি গড়ে উঠেছিল। ছেদ পড়েছিল ব্রিটিশ আসার সময়ে। ঔপনিবেশিক যুগের সূত্রপাত ঘটলো এবং ব্রিটিশ সরকার উপনিবেশকে টিকিয়ে রাখাব তাগিদে সামন্ততান্ত্রিক একটা ব্যবস্থাকে জিইয়ে রেখেছিল। যাই হোক, প্রাক্-ঔপনিবেশিক এবং ঔপনিবেশিক যুগের বিভিন্ন ঘটনাস্রোতের মধ্যে সাঁতার দিতে দিতে মালদা জেলা আজকে পশ্চিমবঙ্গের একটি গুরুত্বপূর্ণ জেলা হিসেবে পরিচিত।

সহায়ক গ্রন্থ

1 . Bengal District Gazetteers : Malda—G.E. Lambourn (Calcutta, 1918).

2 West Bengal District Gazetteers : Malda—Jatindra Chandra Sen Gupta (Calcutta, 1969).

3 Geographical, Statistical and Historical Description of the District, or Zila, of Dinajpur in the Province, or Soubah, of Bengal—Francis Buchanan Hamilton (Calcutta, 1833).

4 A Statistical Account of Bengal—W. W. Hunter, Vol VII, Districts of Maldah, Rangpur and Dinajpur (London, 1876).

5 The Annals of Rural Bengal—W. W. Hunter (London, 1868).

6 Final Report on the Survey and Settlement operations in the District of Malda : 1928 – 35—M.O. Carter (Calcutta, 1939).

7 The Diaries of Streynsham Master : 1675—1680 —Edited by Sir Richard Carnac Temple, Vols. I and II (London, 1911).

8 Bengal District Records : Dinajpur—Edited by W. K. Firminger, Vol. I : 1787 – 89 (Shillong, 1914).

9 The Ruins of Gaur : Described and represented in Eighteen views ; with a Topographical Map, compiled from the Manuscripts and Drawings of the Late H. Creighton (London, 1817).

10 Memoirs of Gaur and Pandua—Khan Sahib Abid

Ali Khan of Maldah. Edited and Revised by H. E. Stapleton (Calcutta 1930).

11 Census of India, 1961, West Bengal District Census Handbook : Malda—B. Ray (Calcutta, 1965).

12 Geographical and Statistical Report of the District of Malda —J. J. Pemberton (Calcutta, 1854).

13 District Credit Plan (1980—82) Malda District, West Bengal—United Bank of India, Development Division (Calcutta, 1980).

14 Annual Action Plan (1982) : Malda District, West Bengal—United Bank of India, Reserch Division (Calcutta, 1982).

15 The History of Bengal, Vol I—Edited by R. C. Majumdar (Dacca, 1943), Vol II—Edited by Jadunath Sarkar (Dacca, 1948).

16 Bengal under Akbar and Jahangir—Tapan Kumar Raychaudhuri (Calcutta, 1953).

17 বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর : স্বাধীন সুলতানদের আমল (১৩৩৮ খ্রীঃ-১৫৩৮ খ্রীঃ) – সুখময় মুখোপাধ্যায় (দুই খণ্ড একত্রে), (কোলকাতা, ১৯৬২).

18 বাঙালীর ইতিহাস (আদিপর্ব) – নীহাররঞ্জন রায় (কোলকাতা, বঙ্গাব্দ, ১৩৫৬).

19 মুক্তিযুদ্ধে ভারতীয় কৃষক – সুপ্রকাশ রায় (কোলকাতা, ১৯৮০)

20 ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম – সুপ্রকাশ রায় (কোলকাতা, ১৯৬৬).

21 গৌড়ের ইতিহাস—রজনীকান্ত চক্রবর্তী, প্রথম খণ্ড (মালদহ, বঙ্গাব্দ, ১৩১৭) ও দ্বিতীয় খণ্ড (মালদহ, ১৯০৯)

22 গৌড় পাণ্ডুয়ার ধারাস্নানে মালদহ—সুধীরকুমার চক্রবর্তী (কোলকাতা, ১৯৮২)

23 জহুরা মন্দির : মালদা, উৎসব ও মেলা—ডাঃ দীপ্তিময় সরকার

(মালদহ, ১৯৮২).

24 ইংরেজবাজার পৌরসভার বর্ষপূর্তি উৎসবের স্মরণিকাতে প্রকাশিত, সুধীরকুমার চক্রবর্তীর প্রবন্ধ, 'তিনশ এক বছরের বৃদ্ধা তরুণী হতে চলেছে' (১৯৮৩) ।

25 The Cambridge Economic History of India, Vol. I —Edited by Tapan Raychaudhury and Irfan Habib Cambridge, 1982) and Vol. II—Edited by Dharma Kumar (Cambridge, 1982).

26 The Swadeshi Movement in Bengal—Sumit Sarkar (New Delhi, 1973).

27 The Riyazu-S-Salatin : A History of Bengal (18-17)—Ghulam Hosain Salim, Translated from Original Persian by Abdus Salam (Calcutta, 1902).

28 H. H.Risley : The Tribes and Castes of Bengal (Calcutta 1891).

29 James Fergusson—History of Indian and Eastern Architecture (London 1891).

30 গৌড় ও পাণ্ডুয়া—যোগেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী (কোলকাতা, বঙ্গাব্দ ১৩২৮)

31 বিয়াল্লিশের বাংলা : রাজশাহী বিভাগ ও কুচবিহার রাজ্য—নির্মল-কুমার বসু (কোলকাতা, বঙ্গাব্দ ১৩৭৬)

32 বাংলাদেশের নদনদী ও পরিকল্পনা—কপিল ভট্টাচার্য (কোলকাতা, ১৯৫৯)

33 কৃষক সভার ইতিহাস—মুহম্মদ আবদুল্লাহ রসুল (কোলকাতা, বঙ্গাব্দ ১৩৭৬).